চোখের উচ্চচাপ
গ্লুকোমা

অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমান ❑ ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম

চোখের উচ্চচাপ
গ্লুকোমা

এই বইয়ের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ
ডাঃ মুস্তাফিজ দাতব্য চক্ষু হাসপাতাল
(গ্রাম-ধলিয়া, থানা-ভালুকা, জেলা-ময়মনসিংহ)-কে
দান করা হবে।

চোখের উচ্চচাপ
গ্লুকোমা

অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমান
চক্ষু বিশেষজ্ঞ

পরিচালক ও প্রধান কন্‌সাল্‌টান্ট
এম এ আই ইন্‌স্টিটিউট অব অফথ্যালমোলজি ও
ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল

ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
চক্ষু বিশেষজ্ঞ

ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল

ভূমিকা

গ্লুকোমার ঠিক বাংলা কোন প্রতিশব্দ নেই। এটা চোখের একটা মারাত্মক অসুখ। সারা বিশ্বে অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ হলো গ্লুকোমা। এ রোগটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল সব দেশেই প্রায় সমানভাবে বিস্তৃত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশে এটি অন্ধত্বের তৃতীয় প্রধান কারণ এবং সাধারণত চল্লিশোর্ধ বয়সের নারী-পুরুষের শতকরা ২ জন এ রোগে ভুগে থাকেন। আমাদের দেশে বহু লোক গ্লুকোমা রোগে ভুগে নিজের অজান্তেই সারাজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যান। অথচ এটি কোন দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। এ রোগের চিকিৎসা আছে। রোগটির উপসর্গ বা লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা গেলে খুব সামান্য ওষুধেই রোগটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রয়োজন বোধে কোন কোন ক্ষেত্রে অপারেশন করলে স্থায়ীভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব। অথচ চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হলে পরিণতি হলো অন্ধত্ব।

শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ গ্লুকোমার ক্ষেত্রেই রোগীর পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটির কোন উপসর্গ বা লক্ষণ বোঝা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে রোগী যখন অনুভব করেন যে, তিনি চোখে কম দেখছেন বা একেবারেই দেখছেন না, তখন সাধারণত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান। এমতাবস্থায় চোখের যা ক্ষতি হয়ে যায় তা স্থায়ীরূপে হয়। তবে দৃষ্টি যেটুকু আছে তা ধরে রাখার জন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন।

যেহেতু গ্লুকোমা ও চোখের ছানি দু'টো রোগই সাধারণত চল্লিশোর্ধ বয়সে হয় এবং এসব রোগীরা ক্রমশ চোখে কম দেখেন। তাই অনেকে গ্লুকোমা হওয়া সত্ত্বেও চোখের ছানি মনে করে চিকিৎসকের কাছে যান না। এসব রোগীর দৃষ্টিশক্তি যখন একেবারে কমে যায় তখন ছানি পেকে গেছে ভেবে এবং অপারেশন করলে ভালো হবেন এ আশা নিয়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু গ্লুকোমার এ পর্যায়ে চিকিৎসা করে আর দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব হয় না। তাই রোগীকে বরণ করে নিতে হয় নীরব এ অন্ধত্বকে। সুতরাং এ রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা রোগীসহ অন্য সকলেরই থাকা একান্ত প্রয়োজন। সে কারণেই আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্লুকোমা সম্পর্কে একটি সঠিক এবং সাধারণ ধারণা দেবার আন্তরিক দায়িত্ব অনুভব করেছি। দেশের

অধিকাংশ মানুষের কাছে বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করা এবং তাদের সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। আর সেজন্য বাংলাভাষায় এই বই রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। ইচ্ছাকৃতভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি এবং অত্যন্ত সহজভাবে সবকিছু বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি, যাতে বইটি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

রোগী যতক্ষণ না পর্যন্ত এ রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গ্লুকোমার সাফল্যজনক নিয়ন্ত্রণ বা সুচিকিৎসা সম্ভব হবে না। চিকিৎসক রোগীকে যখন পরীক্ষা করেন বা প্রথম যখন এ রোগ নির্ণয় করেন তখন এ রোগ সম্পর্কে হয়তো একটি প্রাথমিক ধারণা দেন। কিন্তু এ সময়ে রোগীর সকল প্রকার প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই এই বইটিতে রোগীদের মনের সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ জটিল তথ্য-তত্ত্বকে বাদ দিয়ে আমরা জোর দিয়েছি রোগী যাতে রোগটিকে সহজভাবে সম্যক উপলব্ধি করে এর চিকিৎসার গুরুত্ব বুঝতে পারেন সেদিকে। উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো গ্লুকোমার রোগীও যদি তার চিকিৎসা-উপদেশ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন তবেই তিনি তা নিয়মিত পালন করতে পারবেন। আশা করি এ বইটি রোগীকে রোগ সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের উপদেশ পালনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

এছাড়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকা, গ্লুকোমার রোগী ছাড়াও সেবিকা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বইটি উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই বই লেখার এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকের সাহায্য সহযোগিতাই আমরা পেয়েছি। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক জার্নাল 'প্রেসক্রিপশন'-এর সহ-সম্পাদক ডাঃ নাজমা ইয়াসমীনের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। বইটি রচনার জন্য তিনি যে আন্তরিক উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং সর্বোপরি বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাদের যে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন সে জন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ । তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহায়তা না পেলে এ বই প্রকাশে আরও বিলম্ব হতো। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই ডাঃ জেবুন্নেসা রহমানকে যার উৎসাহ এবং সাহায্য এ বই প্রকাশকে করেছে সহজতর।

গ্লুকোমা রোগটির ওপর মাতৃভাষায় এদেশে এটাই প্রথম বই। সুতরাং আমাদের অজান্তে ভুল-ত্রুটি কিছু থাকতে পারে। আশা করি সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ বই সম্পর্কিত যে কোন মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

বইটি এদেশের মানুষের উপকারে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবো।

অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমান

ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম।

আপনি কি জানেন

- চোখের উচ্চচাপ বা গ্লুকোমা অকাল অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ।
- পয়ত্রিশ বছরের উর্দ্ধে শতকরা প্রায় দুই জনের এ রোগ আছে।
- গ্লুকোমা ধীরে ধীরে ও নিরবে দৃষ্টিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়।
- গ্লুকোমা রোগের বাহ্যিক কোন লক্ষণ না-ও থাকতে পারে।
- অনেকক্ষেত্রে এ রোগ বংশানুক্রমিক।

সূচীপত্র

চোখের গঠন এবং কাজ	১৩
অ্যাকুয়াস হিউমার	১৯
চোখের উচ্চচাপ গ্লুকোমা	২৩
গ্লুকোমার শ্রেণীবিভাগ	২৫
প্রাথমিক ও সেকেণ্ডারি গ্লুকোমা — কোনটি বেশি ক্ষতিকর	২৮
উপসর্গহীন চোখে গ্লুকোমা	২৯
গ্লুকোমা ও উচ্চ রক্তচাপ	৩০
পানি চা কফি ও গ্লুকোমা	৩১
অন্ধকার ও গ্লুকোমা	৩২
পড়াশুনা সেলাই টি. ভি ও গ্লুকোমা	৩৩
গ্লুকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর ওষুধ	৩৪
চোখের ছানি ও গ্লুকোমা	৩৫
দেশে-বিদেশে গ্লুকোমার প্রভাব	৩৬
গ্লুকোমা রোগী ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য	৩৭
গ্লুকোমা রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা	৩৮
জন্মগত গ্লুকোমা	৪৭
প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা	৫০
অকুলার হাইপারটেনশন	৫৪
লো টেনশন গ্লুকোমা	৫৫
প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা	৫৬
গ্লুকোমা প্রতিরোধ	৬৩

Goto List >

চোখের গঠন এবং কাজ

চোখের উচ্চচাপ বা গ্লুকোমা রোগটি আমাদের দেশের অনেক মানুষের কাছে অপরিচিত হলেও রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশন রোগটি সম্বন্ধে অনেকেরই কিন্তু অল্পবিস্তর ধারণা আছে। রক্তের যেমন একটি স্বাভাবিক চাপ রয়েছে তার চেয়ে বেশি হলেই সেটা উচ্চ-রক্তচাপ, তেমনি চোখের অভ্যন্তরেও একটি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক চাপ রয়েছে। চোখের অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক চাপ হচ্ছে ১০ মিলিমিটার অব মার্কারি থেকে ২১ মিলিমিটার অব মার্কারি। কোন কারণে এই চাপ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি বেড়ে গিয়ে চোখের দৃষ্টি ক্ষমতার ক্ষতি করলে তাকেই গ্লুকোমা বলে।

গ্লুকোমা সম্বন্ধে জানতে গেলে চোখের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। চোখ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে রোগটি বিস্তারিতভাবে জানা এবং বোঝা যেমন সহজ হবে, তেমন রোগটি কতটা মারাত্মক তা উপলব্ধি করা যাবে এবং রোগটির প্রতি অবহেলাও কম হবে। এখানে চোখের যে অংশগুলি গ্লুকোমা রোগটির সঙ্গে জড়িত সেগুলিই মূলত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

চোখ

আমাদের মাথার খুলির সম্মুখভাগে দুটি চক্ষুকোটরের (obit) মধ্যে চোখ দুটি থাকে। চোখের দুটো পাতার মাঝখানে আমরা চোখের খুব সামান্য অংশই দেখতে পাই; বেশিরভাগ অংশই থাকে চক্ষুকোটরের ভেতরে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। চক্ষুকোটরের মধ্যস্থিত অক্ষিগোলকই চোখের মূল অংশ।

অক্ষিগোলক (Eyeball)

অক্ষিগোলকের মধ্যে চোখের জলীয় পদার্থ যেমন অ্যাকুয়াস, ভিট্রিয়াস এবং লেন্স ইত্যাদি থাকে এবং এর বাইরের আবরণ তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি।

সবচেয়ে বাইরের স্তরের নাম — কর্নিয়া-স্ক্লেরা ; মধ্যের স্তর — ইউভিয়াল ট্রাক্ট; সবচেয়ে ভেতরের স্তর — রেটিনা।

www.banglainternet.com

Goto List >

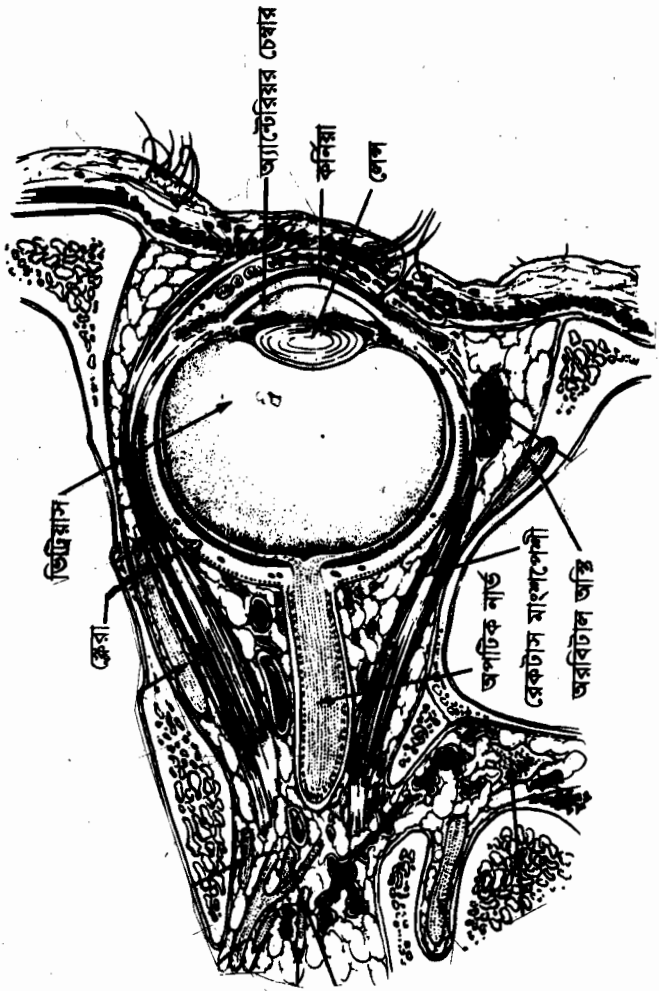

চক্ষু কোটরের মধ্যে চোখের অবস্থান (লম্বচ্ছেদ)

www.banglainternet.com

অক্ষিগোলকের বাইরের স্তর

বাইরের স্তরটি শক্ত, মোটা ও তন্তুজাত বা ফাইব্রাস টিস্যুর আবরণ। এই স্তরটির সম্মুখের $\frac{১}{৬}$ অংশ দেখতে স্বচ্ছ এবং বেশি উত্তল বা কনভেক্স। এর নাম কর্নিয়া। এটা দেখতে কাচের মতো স্বচ্ছ। কর্নিয়ার পেছনে আইরিস থাকার কারণে একে কালো বা বাদামী মনে হয়। কর্নিয়ার ভেতর দিয়েই চোখে আলো প্রবেশ করে। এতে কোন রক্তনালী নেই, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্নায়ু বা নার্ভ রয়েছে।

এই স্তরের পেছনের $\frac{৫}{৬}$ অংশ অর্থাৎ কর্নিয়া বাদে বাকী অংশ বেশ পুরু, সাদা এবং অসচ্ছ। একে বলা হয় স্ক্লেরা। চোখের পাতার ভেতর দিক এবং স্ক্লেরা একটি পাতলা পর্দায় ঢাকা — একে বলে কনজাংটিভা (নেত্রবর্ত্মকলা)। এই পর্দায় অনেক সুক্ষ্ম রক্তবাহী নালী আছে।

কর্নিয়া ও স্ক্লেরার মিলনস্থানকে বলে লিম্বাস। এই লিম্বাস চোখের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। কারণ চোখের ভেতর থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার এই লিম্বাসের বিভিন্ন অংশের (structure) ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চোখের বাইরের শিরায় প্রবেশ করে। এই লিম্বাসে কোন প্রকার অসুবিধা থাকলে অনেক সময় চোখের চাপ বা প্রেসার বেড়ে গিয়ে গ্লুকোমার সৃষ্টি করতে পারে।

স্ক্লেরার গায়েই রেকটাস মাংশপেশীগুলি লাগানো থাকে যার ফলে চোখ বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়।

স্ক্লেরার পেছন দিয়ে অপটিক নার্ভ বা অক্ষিস্নায়ু বের হয়। এছাড়া ৪টি বড় শিরা (ভেনা ভরটিকোসি), চোখের ভেতর থেকে স্ক্লেরার ভেতর দিয়ে বাইরে বের হয়। এবং অপটিক নার্ভের চতুর্দিক দিয়ে ছোট ও বড় সিলিয়ারি ধমনি চোখের মধ্যে প্রবেশ করে।

অক্ষিগোলকের মধ্যস্তর

বাইরের স্তর — স্ক্লেরা-কর্নিয়া এবং ভেতরের স্তর রেটিনার মাঝখানে থাকে মধ্যস্তর — ইউভিয়াল ট্রাক্ট। ইউভিয়াল ট্রাক্ট-এর ৩টি অংশ — পেছন থেকে সামনে (ক) কোরয়েড (খ) সিলিয়ারি বডি ও (গ) আইরিস।

(ক) সবচেয়ে বড় ও পেছনের চকোলেট রং-এর রক্তনালীতে ভরা অংশের নাম কোরয়েড।এই স্তরে ছোট বড় ধমনি, শিরা রয়েছে যা চোখের পুষ্টি সরবরাহ করে।

www.banglainternet.com

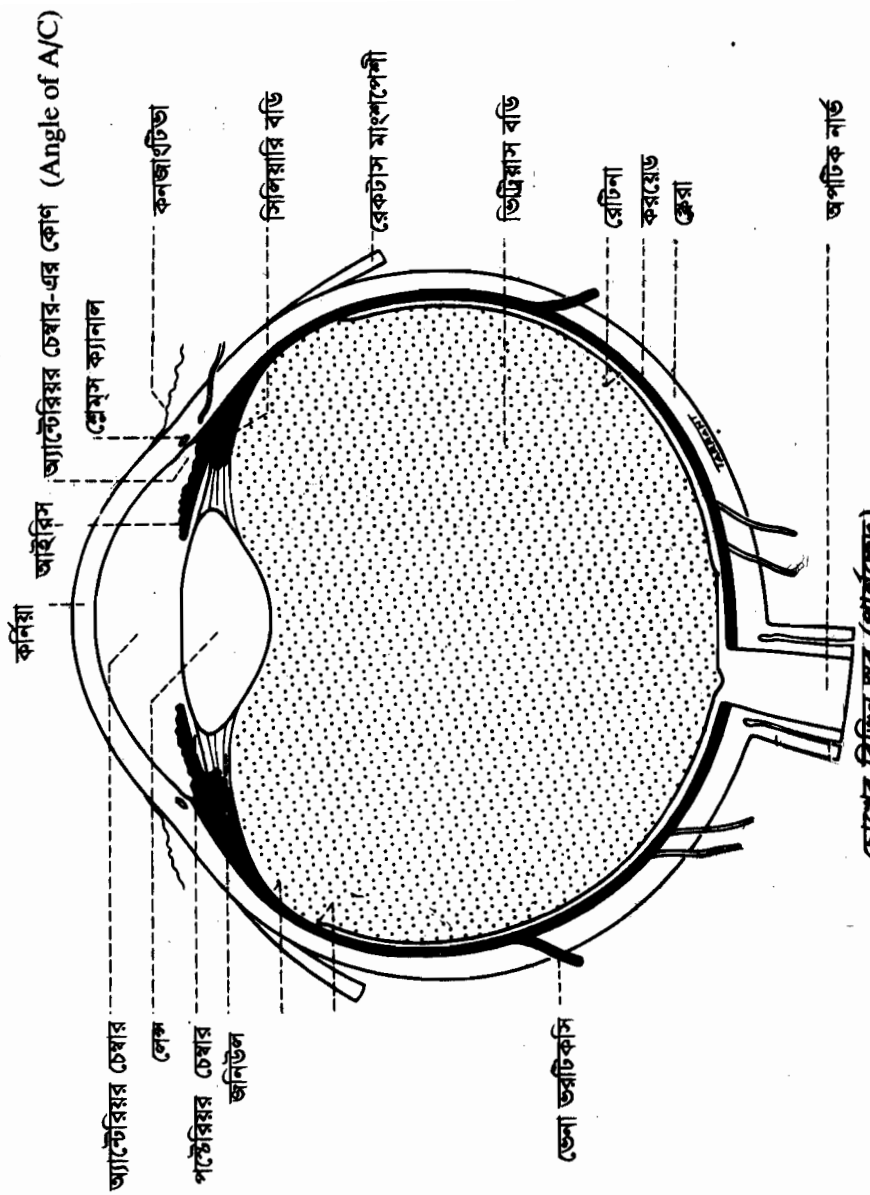

www.banglainternet.com

(খ) কোরয়েডের সামনের দিকে সিলিয়ারি বডি অবস্থিত। সিলিয়ারি বডিতে সিলিয়ারি প্রসেস রয়েছে — যার কোষ থেকেই চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়া সিলিয়ারি বডির পেছনে সুতার মতো সাসপেনসরি লিগামেন্ট থাকে — যা লেন্সের ক্যাপসুলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং লেন্সকে ঝুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

(গ) ইউভিয়াল ট্রাক্ট-এর সবচাইতে সামনের অংশটুকুকে আইরিস বলে। সিলিয়ারি বডির পাদদেশ থেকে আরম্ভ হয়ে অক্ষিতারা বা পিউপিল পর্যন্ত এটা বিস্তৃত। আইরিসের রং অনুযায়ী চোখকে কালো হরিণ চোখ, বিড়ালাক্ষী বা কটা চোখ ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করা হয়।

আইরিসের ঠিক মাঝখানে যে ছিদ্র থাকে তাকেই বলা হয় পিউপিল বা অক্ষিতারা। আলো এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে। চোখের কর্নিয়া এবং লেন্সের মধ্যবর্তী স্থানকে আইরিস (ডায়াফ্রাম বা পর্দার মতন) দুই ভাগে ভাগ করেছে। সামনের অংশটির নাম সামনের বা অ্যান্টেরিয়র চেম্বার (Anterior chamber) আর পেছনের অংশটির নাম পেছনের বা পস্টেরিয়র চেম্বার (Posterior chamber)

পস্টেরিয়র চেম্বারে সিলিয়ারি বডি থেকে চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হয় এবং পিউপিলের মধ্য দিয়ে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে প্রবেশ করে। এখান থেকে লিম্বাস হয়ে চোখের বাইরে চলে যায়।

অক্ষিগোলকের ভেতরের স্তর

অক্ষিগোলকের আবরণের তিনটি স্তরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরের নাম অক্ষিপট বা রেটিনা। এটাকে নার্ভাস স্তর বলে কারণ এই স্তরেই চোখে প্রবেশকৃত আলোকে ধারণ করবার মতো স্নায়ুকোষ রয়েছে। এখান থেকে আলো অপটিক নার্ভের সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং আমরা দেখতে পাই।

অপটিক ডিস্ক

রেটিনার যে স্থান থেকে অপটিক নার্ভ আরম্ভ হয় তাকে অপটিক ডিস্ক বলা হয়। এর পরিধি ১.৫ মিঃ মিঃ। অফথ্যালমোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে এটা দেখতে চাকতি বা থালার মতো মনে হয়। এর রং কিছুটা হালকা সুতরাং সহজেই একে চেনা যায়। এর মধ্যখানে একটু গর্তের মতো থাকে — তাকে ফিজিওলজিকাল কাপ বলে।

www.banglainternet.com

গ্লুকোমা বা চোখের উচ্চচাপ রোগে এই ফিজিওলজিকাল কাপ বড় হতে থাকে এবং যখন কাপটি অপটিক ডিস্কের সমান হয়ে যায় তখন ঐ ব্যক্তি সাধারণত অন্ধ হয়ে যান।

লেন্স (Lens)

অক্ষিগোলকের আইরিস ও ভিট্রিয়াসের মধ্যে ৯-১০ মিঃ মিঃ পরিধির ও ৪-৫ মিঃ মিঃ পুরু একটি লেন্স আছে। ভিট্রিয়াস বডির সামনের দিকে একটি খাদ আছে যেখানে লেন্সটি থাকে। এছাড়া সিলিয়ারি বডির সাসপেন্সারি লিগামেন্ট দিয়েও এটা ঝুলানো থাকে।

চোখের এই লেন্সটি উভয়দিকে উত্তল (উমভশণস) অর্থাৎ বাইকনভেক্স। দূরে এবং কাছে দেখার জন্য লেন্সের পুরুত্ব-এর পরিবর্তন হয়। এর ফলে চোখের পাওয়ার-এরও পরিবর্তন ঘটে এবং পরিষ্কার দেখতে সাহায্য করে।

ভিট্রিয়াস বডি

স্বচ্ছ জেলির মতো আঠালো ভিট্রিয়াস অক্ষিগোলকের ৪/৫ ভাগ জুড়ে থেকে এটা চোখের আকার ও স্থিরতা বজায় রাখে। ভিট্রিয়াস লেন্সের পেছন থেকে আরম্ভ করে রেটিনার অপটিক ডিস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। ভিট্রিয়াসের মধ্যে কোন রক্তনালী নাই — তাই অ্যাকুয়াস থেকে এটা পুষ্টি লাভ করে।

www.banglainternet.com

Goto List >

অ্যাকুয়াস হিউমার
(Aqueous humour)

অ্যাকুয়াস হিউমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায় পানির মতো স্বচ্ছ তরল পদার্থ। এটি চোখের পেছনের ও সামনের চেম্বারে থাকে। অনবরত তৈরি হয় ও চোখের কয়েকটি অংশের পুষ্টি প্রদান করে এবং এসব অংশের বর্জ্য বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ (waste products) নিয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে যায়।

তৈরির প্রক্রিয়া

অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে ঃ

(১) ক্ষরণ (Active secretion)

সিলিয়ারি বডির যে ৭০টি সিলিয়ারি প্রসেস রয়েছে তার ভেতরের দিকে রয়েছে নন পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম (N.P.E) নামের কোষ। এই কোষ থেকে ৮০% অ্যাকুয়াস হিউমার ক্ষরণ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে পেছনের চেম্বারে পতিত হয়।

(২) অধি-পরিস্রবন (Ultra filtration)

২০ শতাংশ অ্যাকুয়াস এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে পেছনের চেম্বারে আসে। রক্ত ও অ্যাকুয়াস হিউমারের মধ্যে একটি পর্দা (Blood aqueous barrier) কাজ করে বলে এই প্রক্রিয়ায় সামান্য অ্যাকুয়াস তৈরি হয়।

(৩) পরিব্যাপ্তি (Diffusion)

নন পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম কোষের দেয়ালে চর্বিজাতীয় পদার্থ আছে, যার মাধ্যমে চর্বিতে দ্রবণীয় খুব সামান্য পদার্থ রক্ত থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার হয়ে পেছনের চেম্বারে আসতে পারে।

অ্যাকুয়াস সঞ্চালন (Aqueous circulation)

প্রতি মিনিটে মাত্র ২ মাইক্রোলিটার অ্যাকুয়াস তৈরি হয়ে চোখের পেছনের চেম্বারে পতিত হয়। সেখান থেকে পিউপিল দিয়ে সামনের চেম্বারে প্রবেশ

www.banglainternet.com

করে। পেছনের চেম্বারে মাত্র ০.০৬ মিলিলিটার এবং সামনের চেম্বারে মাত্র ০.২৫ মিলিলিটার অ্যাকুয়াস থাকে। প্রতি ১০০ মিনিটে পুরাতন অ্যাকুয়াস ধীরে ধীরে চোখ থেকে বেরিয়ে যায় এবং নতুন অ্যাকুয়াস অল্প অল্প এসে সেই স্থান পূরণ করে।

অ্যান্টেরিয়র চেম্বার-এর কোণ এবং অ্যাকুয়াস সঞ্চালন

সামনের চেম্বারে আইরিসের গরমে (রক্তনালী থাকার দরুণ আইরিস গরম হয়) এবং ঠান্ডা কর্নিয়ার (বাতাসের সংস্পর্শে থাকে বলে কর্নিয়া ঠান্ডা থাকে এবং এর মধ্যে কোন রক্তনালী নেই) কারণে অ্যাকুয়াস স্রোতের ন্যায় চারিদিকে ঘুরতে থাকে ও চোখ থেকে বেরিয়ে যায়। অ্যাকুয়াস দুটি পথ দিয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে যায়।

(ক) শতকরা ৮০ ভাগ অ্যাকুয়াস সামনের চেম্বার থেকে এর কোণে (Angle of A/C) লিম্বাসের পেছনের ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কে যায় এবং সেখান থেকে শ্লেম্‌স ক্যানাল হয়ে স্ক্লেরার সংগ্রাহক নালীতে (collecting duct) পৌছায়। সেখান থেকে স্ক্লেরাল ভেনাস প্লেক্সাস ও পরে এপিস্ক্লেরাল ভেনাস প্লেক্সাস হয়ে অ্যানটেরিয়র সিলিয়ারি ভেনে প্রবেশ করে সিস্টেমিক রক্ত সঞ্চালনের (Systemic circulation) সঙ্গে মিশে যায়। সংগ্রাহক নালী থেকে

www.banglainternet.com

সামান্য কিছু অ্যাকুয়াস সরাসরি অ্যাকুয়াস শিরা দিয়ে অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি শিরায় যায়।

(খ) অ্যাকুয়াস হিউমারের বাকি শতকরা ২০ ভাগ সামনের চেম্বারের কোণে সিলিয়ারি বডিতে প্রবেশ করে এবং এর কিছু অংশ সিলিয়ারি বডি ও করয়েডের শিরায় প্রবেশ করে, আর বাকি অংশ স্ক্লেরাতে পরিব্যাপ্ত হয়ে অক্ষিকোটরে চলে যায়। এই পথকে ইউভিও স্ক্লেরাল পথ (Uveo scleral outflow) বলা হয়ে থাকে।

অ্যাকুয়াস হিউমারের কাজ

(১) চোখের সামনের অংশকে পূর্ণ করে এবং প্রতিসরাঙ্ক মাধ্যম (Refractive media) হিসেবে কাজ করে।

(২) চোখের যে সকল অংশে রক্ত সরবরাহ নেই যেমন কর্নিয়া, লেন্স, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট, ট্রাবিকিউলার মেশওয়ার্ক ও ভিট্রিয়াস বডিকে খাবার ও পুষ্টি দেয় এবং এসকল অংশ থেকে বিপাক প্রক্রিয়ায় (Metabolic waste products) বর্জ্য অংশ বের করে দেয়।

(৩) অ্যাকুয়াস নামক তরল পদার্থ তৈরি হওয়া ও নিয়ন্ত্রিত সঞ্চালনের মাধ্যমে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপের (Intra-ocular pressure) সমতা রক্ষিত হয়।

অ্যাকুয়াসের জৈবরসায়ন

প্রায় পানির মতো এই অ্যাকুয়াস হিউমার সরাসরি রক্ত থেকে তৈরি হয় না বলে এর গঠন রক্তের প্লাজমার কাছাকাছি — কিন্তু এক নয়। অ্যাকুয়াসে পানির পরিমাণ শতকরা ৯৯.৯ ভাগ, আর বাকি শতকরা ০.১ ভাগ কঠিন পদার্থ (Solid)। কঠিন পদার্থের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ভিটামিন সি এবং খুব সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ ও প্রোটিন।

রক্ত-অ্যাকুয়াসের মধ্যে পর্দা (Blood aqueous barrier) থাকার দরুণ অ্যাকুয়াসে গ্লুকোজ এবং প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। তবে চোখের কয়েকটি অসুখে যেমন ইউভিয়াইটিজ-এ (Uveitis) এই পর্দার অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় বলে, রক্ত থেকে প্রোটিন খুব বেশি চলে আসে। (যা স্লিট ল্যাম্প নামক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়)।

www.banglainternet.com

চোখের চাপ/চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ (Intra Ocular Pressure, I.O.P.)

চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বলতে আইবলের আবরণীর পার্শ্বচাপকে বোঝায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ১০ মিঃ মিঃ মারকারি থেকে ২১ মিঃ মিঃ মারকারি এর মধ্যে থাকে। দিনে রাতে বিভিন্ন সময়ে এই চাপের পরিবর্তন হতে পারে। খুব সকালে ৬টার দিকে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ সবচাইতে বৃদ্ধি পায় ও ৩-৪ মিঃ মিঃ বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে সবচাইতে কম থাকে। যাদের চোখে উচ্চচাপ হবার প্রবণতা আছে তাদের রক্তের চাপ বেড়ে গেলে সাময়িকভাবে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ও চোখের চাপের সামান্য পরিবর্তন হয়। বেশি করে পানি খেলে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। আবার অনেকক্ষণ অন্ধকারে কাজ করলেও চাপ বাড়তে পারে।

তবে যখনই বা যে কারণেই হোক চোখের চাপ ২১ মিঃ মিঃ মারকারির বেশি হলে তা স্বাভাবিক নয়। তখন আমরা বলি চোখের উচ্চচাপ। আর এই উচ্চচাপ অপটিক নার্ভের ক্ষতি করার ফলে যদি দৃষ্টিক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকে গ্লুকোমা বলে।

www.banglainternet.com

Goto List >

চোখের উচ্চচাপ
গ্লুকোমা

গ্লুকোমা রোগ বলতে কি বুঝায়

চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ ১০ মিঃ মিঃ মারকারি থেকে ২১ মিঃ মিঃ মারকারি পর্যন্ত। এই চাপ কোন কারণে বেড়ে গেলে চোখের (অপটিক) নার্ভ ও অন্যান্য অংশের ক্ষতিসাধন করে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, বিশেষ করে দৃষ্টির পরিসীমার পরিবর্তন হয়। চোখের এই অবস্থার নামই গ্লুকোমা।

আগেই বলা হয়েছে যে, চোখের সামনের ভাগে পেছনের চেম্বারে অনবরত যে তরল পদার্থ বা অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হচ্ছে তা সামনের চেম্বারের কোণ (Angle of Anterior chamber) দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কোন কারণে এই অ্যাকুয়াস বেশি তৈরি হলে কিংবা চোখ থেকে বেরিয়ে যাবার পথে বাধার সৃষ্টি হলে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যায় এবং গ্লুকোমা রোগের উৎপত্তি হয়।

- অনেক সময় এ রোগে কোন উপসর্গ ছাড়াই চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- কোন কোন ক্ষেত্রে উপসর্গের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে চোখ অন্ধ হতে পারে।
- আবার অনেক শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে।

  আমাদের দেশে পয়ত্রিশোর্ধ বয়সীদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রভাব শতকরা ২ ভাগ। ক্রমশ দৃষ্টিহীন হওয়া ছাড়া আর কোন উপসর্গ না থাকার দরুণ অনেক রোগী প্রায় অন্ধ হয়ে চক্ষু বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হন — যখন কোন চিকিৎসা করা আর সম্ভব হয় না।
- এক ধরনের গ্লুকোমাতে চোখ লাল হয় এবং প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোন অসুবিধা না হওয়ায় রোগীরা সাধারণ চোখ ওঠা মনে করে ভালো চিকিৎসা করান না, এর ফলেও গ্লুকোমা রোগনির্ণয়ে বিলম্ব ঘটে। এসব

www.banglainternet.com

বিষয় বিবেচনা করে যাতে গ্লুকোমা রোগে চোখ অন্ধ না হয়, তার জন্য এই রোগটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

কিভাবে চোখের চাপ বাড়ে

ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে শক্ত আবরণের একটি পানির পাত্রে যদি ওপর থেকে নলের সাহায্যে পানি আসে তা নিচের নল দিয়ে বের হয়ে যায়। (চিত্র - ক)। কিন্তু যদি নিচের নলটিকে একটি সুতা দিয়ে হালকা বা জোরে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে পানি ফোটা ফোটা পড়বে কিংবা বন্ধ হয়ে যাবে। (চিত্র - খ)। তখন পানির পাত্রটি যদি সম্প্রসারিত হওয়ার (ইলাস্টিকের মতো) ক্ষমতা না থাকে তাহলে এর অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যাবে।

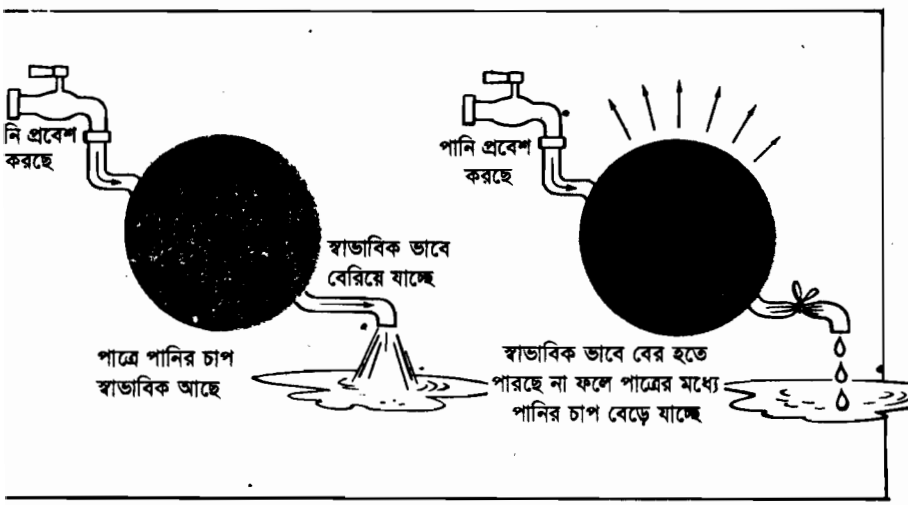

অনুরূপভাবে চোখের মধ্যে ক্রমাগত অ্যাকুয়াস তৈরি হচ্ছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন কারণে বেরোবার রাস্তাটিতে বাধা পেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে, যেহেতু চোখের আয়তন বড় হতে পারে না, সে কারণে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে গিয়ে চোখের বিভিন্ন অংশের ক্ষতিসাধন করে থাকে। বিশেষ করে অপটিক নার্ভ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। এর ফলে তার দৃষ্টির পরিধি আস্তে আস্তে সংকুচিত হতে থাকে এবং তার সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পায়। এবং শেষ পর্যায়ে অন্ধ হয়ে যায়।

www.banglainternet.com

Goto List >

গ্লুকোমার শ্রেণীবিভাগ

রোগের উৎপত্তি এবং কারণ অনুযায়ী গ্লুকোমাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক গ্লুকোমা ও সেকেন্ডারি গ্লুকোমা।

(ক) প্রাথমিক গ্লুকোমা (Primary Glaucoma) : এই ধরনের গ্লুকোমা চোখের সামনের চেম্বারের কোন বিকাশগত ত্রুটির জন্য হয়ে থাকে। সাধারণত দুই চোখই প্রাথমিক গ্লুকোমায় আক্রান্ত হয়। ৩৫ বছর বয়সের পরে নারী বা পুরুষ উভয়েরই এই ধরনের গ্লুকোমা হতে পারে। এই রোগ সাধারণত বংশাণুক্রমিক হয়ে থাকে।

চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথে অর্থাৎ সামনের চেম্বারের কোণে, কোন কারণে বাধা সৃষ্টি হলে যদি চোখের চাপ বেড়ে যায় তবে তাকে প্রাথমিক গ্লুকোমা বলা হয়। এখানে চোখের বা শরীরের অন্য কোন রোগের সঙ্গে চাপ বাড়ার সম্পর্ক থাকে না। প্রাথমিক গ্লুকোমাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১। জন্মগত গ্লুকোমা

২। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা

৩। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা

১। **প্রাথমিক জন্মগত গ্লুকোমা** (Primary Congenital Glaucoma) : সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলে বিকাশগত ত্রুটির কারণে এই রোগ হতে পারে।

২। **প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা** (Primary Open Angle Glaucoma, POAG) : এই গ্লুকোমাতে সামনের চেম্বার-এর কোণ বা অ্যাঙ্গেল স্বাভাবিক চোখের মতোই খোলা থাকে। অ্যাঙ্গেল দেখার যন্ত্র গোনিওস্কোপ (Gonioscope) দিয়ে দেখলে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না।

www.banglainternet.com

এই ধরনের গ্লুকোমাই সাধারণত বংশাণুক্রমিক হয়ে থাকে এবং এদের সামনের চেম্বারের কোণে বিকাশগত ত্রুটির কারণে অ্যাকুয়াস বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে চোখের চাপ অনেক বছর ধরে আস্তে আস্তে বাড়ে।

৩। **প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা** (Primary Angle Closure Glaucoma) এই রোগীর সামনের চেম্বার জন্মগতভাবে স্বল্প গভীর থাকে এবং সামনের চেম্বারের কোণ সরু থাকে। সাধারণত যাদের দূর-দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রপিয়া (Hypermetropia) আছে তাদের এই রোগ বেশি হয়। কোন কারণে যদি এই সামনের চেম্বারের সরু কোণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অ্যাকুয়াস-এর বহির্গমন বন্ধ হয়ে যায়, ফলে চোখের চাপ হঠাৎ করে বেড়ে যায়।

(খ) সেকেন্ডারি গ্লুকোমা (Secondary Glaucoma) : চোখের বা শরীরের অন্য কোন রোগে চোখের চাপ বৃদ্ধি পেলে তাকে সেকেন্ডারি গ্লুকোমা বলা হয়। এধরনের গ্লুকোমা সাধারণত এক চোখে হয়ে থাকে। চোখের ও শরীরের বহু কারণেই চোখের চাপ বেড়ে সেকেন্ডারি গ্লুকোমা হতে পারে। খুব সাধারণ (Common) কারণগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

সেকেন্ডারি গ্লুকোমার সাধারণ কারণসমূহ

১। চোখে আঘাতজনিত কারণে,

২। চোখের ইউভিয়াইটিজ (Uveitis), স্ক্লেরাইটিজ (Scleritis) ইত্যাদির জটিলতা হিসেবে।

৩। চোখের ভেতরে রক্তক্ষরণ হলে (Hyphaema),

৪। চোখের লেন্স ফুলে গেলে, যেমন ছানির প্রাথমিক পর্যায়ে,

৫। লেন্সের স্থানচ্যুতি হলে,

৬। ছানি বেশি পেকে গেলে,

৭। চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের জটিলতা হিসেবে,

৮। চোখের ভেতর কোন টিউমার হলে,

৯। চোখে নতুন ধমনী বা শিরা তৈরি হয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ করলে,

১০। কেন্দ্রীয় রেটিনাল ভেন বন্ধ হয়ে গেলে (Central retinal vein occlusion),

www.banglainternet.com

Goto List >

১১। কোন কোন ওষুধ যেমন স্টেরয়েড, এট্রপিন-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে।

এই ধরনের গ্লুকোমার কারণ দূর করতে পারলে এই রোগ ভালো হয়ে যাবার খুব সম্ভাবনা থাকে।

www.banglainternet.com

Goto List >

প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি গ্লুকোমা কোনটি বেশি ক্ষতিকর

গ্লুকোমা যে ধরনেরই হোক তা চোখের জন্য ক্ষতিকর। তবে সেকেন্ডারি গ্লুকোমা কোন চোখের অসুখের কারণে হয় বলে এর উপসর্গ প্রথম থেকেই ধরা পড়ে এবং রোগী চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেবার সুযোগ পান। প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ ও জন্মগত গ্লুকোমাতেও প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দেয় ও রোগীরা চিকিৎসকের কাছে এসে থাকেন। কিন্তু প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমাতে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোন উপসর্গ থাকে না বলে এসব রোগীরা চিকিৎসকের নিকট আসেন না। তাছাড়া এ রোগেও চোখের ছানি রোগের মতো দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে কমে যায় বলে অনেকে এই রোগকে ছানি রোগ ভেবে ও ছানি পাকার ভ্রান্ত অপেক্ষায় থাকেন, ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লুকোমা নির্ণয় হয় না। পরিণতি হিসেবে এই সমস্ত রোগীরা অন্ধত্ব বা প্রায় অন্ধত্ব নিয়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন যখন চিকিৎসা করার তেমন কিছু থাকে না। কারণ এই রোগে চোখের দৃষ্টিশক্তির যে ক্ষতি হয় তা শত চিকিৎসা করলেও ফিরে পাওয়া যায় না। এই বিষয়টি বিবেচনা করলে **প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমাকেই** বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই রোগের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় প্রয়োজন। আর একবার রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে, রোগীকে তার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝানো গেলে চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ হয়।

www.banglainternet.com

Goto List >

উপসর্গহীন চোখে গ্লুকোমা

আপনার চোখে কোন উপসর্গ নেই তবুও আপনার গ্লুকোমা আছে কি?

আমাদের দেশের কম লোকেই গ্লুকোমা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। চোখের অন্ধত্বের এটি একটি প্রধান কারণ। কিন্তু তার গ্লুকোমা আছে কি নেই সেটি কিভাবে বুঝবেন? এ প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। হ্যাঁ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে **প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমাতে** রোগীরা প্রাথমিক অবস্থায় কিছু বুঝতে পারেন না। তাদের চোখে কোন ব্যাথা নেই, লাল হয় না, দূরে ও নিকটে দেখেনও ভালো। আর এই কারণেই চিকিৎসকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। কারণ এই রোগটি শুধু চিকিৎসকরাই সাধারণত নির্ণয় করে থাকেন।

এই রোগটি যেহেতু ৩৫ বছরের বেশি বয়সে শুরু হয় এবং খুব ধীরে ধীরে চোখের চাপ বেড়ে চোখের (অপটিক) নার্ভের ক্ষতি করে, সেহেতু ৩৫ বছরের বেশি বয়সের যে কোন রোগীকেই চল্লিশা চশমা (Pressbyopic glass) দেবার সময় সম্পূর্ণ চোখের পরীক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি, অপথ্যালমোস্কোপ-এর সাহায্যে অপটিক ডিস্ক-এর পরীক্ষা ও চোখের চাপ (Tonometry) পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং এসব রিপোর্ট ব্যবস্থাপত্রে বা রোগীর ফাইলে লিখে রাখা উচিত।

যদি কোন রোগীর অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন থাকে কিংবা চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই তার দৃষ্টির পরিসীমার পরীক্ষা করাতে হবে এবং সুযোগ থাকলে অপটিক ডিস্কের ছবি তুলে রাখতে হবে। (বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে ঐ ছবি তোলা হয়)।

কোন রোগীর গ্লুকোমা রয়েছে এমন সন্দেহ করলে তার জন্য আরও বিশেষ দু'একটি পরীক্ষা করানো যেতে পারে। এই গ্লুকোমা যেহেতু বংশগত, সে কারণে কোন রোগীর গ্লুকোমা ধরা পড়লে তার বাবা-মা, নিকটাত্মীয়দেরও চোখে গ্লুকোমা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। ডায়াবেটিক রোগী ও অতি মায়োপিক (High Myopic) রোগীদের মধ্যে এই গ্লুকোমার হার বেশি। সুতরাং এসব রোগীকে ৩৫ বছর বয়স না হলেও গ্লুকোমার পরীক্ষাসমূহ করানো উচিত।

www.banglainternet.com

Goto List >

গ্লুকোমা ও উচ্চ রক্তচাপ
(Glaucoma and Hypertension)

রক্তের উচ্চচাপের সঙ্গে চোখের উচ্চচাপ বা গ্লুকোমার একটি সম্পর্ক আছে। দেখা যায় রক্তের চাপ প্রতি ১০ মিঃ মিঃ মারকারি বাড়ার দরুন চোখের চাপ ১ মিঃ মিঃ মারকারি বেড়ে যায়। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় ২/১ দিনের মধ্যেই চোখের এই বাড়তি চাপ ঠিক হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে রক্তের চাপ খুব বেশি না বাড়লে চোখে তেমন ক্ষতি হয় না। বরং ৬০/৭০ বছর বয়সে রক্তের ধমনি ও শিরা শক্ত (Sclerosis) হয়ে যাবার ফলে চোখে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ কম হয় এবং অপটিক নার্ভ ফাইবারের ক্ষতি হতে পারে। এই দিক দিয়ে বয়স্ক রোগীদের রক্তের চাপ কোন কারণে অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে অপটিক নার্ভের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় এবং এর ফাইবারের ক্ষতিসাধন করে ও দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়।

www.banglainternet.com

Goto List >

পানি চা কফি ও গ্লুকোমা

সাধারণ মাত্রায় পানি, চা বা কফি খেলে গ্লুকোমা হয় না। কিন্তু যদি কারও বংশগত গ্লুকোমার প্রবণতা থেকে থাকে তাহলে অতি মাত্রায় পানি, চা বা কফি সেবন তার জন্য ক্ষতিকর। কয়েক মিনিটের মধ্যে ১ লিটার পানি পান করলে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে। যাদের চোখে গ্লুকোমা হবার সম্ভাবনা নেই তাদের ২ থেকে ৭ মিঃ মিঃ মারকারি পর্যন্ত এই চাপ বাড়ে। কিন্তু যাদের গ্লুকোমা হবার সম্ভাবনা আছে (Glaucoma suspect) তাদের ক্ষেত্রে এই চাপ ৮/১০ মিঃ মিঃ মারকারি বা এরও বেশি বেড়ে যেতে পারে ও অপটিক নার্ভের ক্ষতি করতে পারে।

এভাবে এক লিটার পানি পান করিয়ে সম্ভাব্য রোগীদের সত্যিকার অর্থে গ্লুকোমা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষাটির নাম ওয়াটার ড্রিংকিং টেস্ট (Water Drinking Test.)

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যাদের বংশগত কারণে গ্লুকোমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা একসঙ্গে বেশিমাত্রায় পানি খেলে, যেমন — অনেকে হাইড্রেশন-থেরাপি হিসাবে সকালে ৩/৪ গ্লাস পানি একই সঙ্গে খেয়ে ফেলেন অথবা কিডনি রোগের জন্য অনেকে একসঙ্গে প্রচুর পানি খান তাদের চোখের চাপ বেড়ে গ্লুকোমা রোগ হতে পারে। তাই এদের মাঝে মধ্যে গ্লুকোমা রোগের জন্য চক্ষু পরীক্ষা করানো উচিত।

www.banglainternet.com

অন্ধকার ও গ্লুকোমা

অনেকে বেশিক্ষণ অন্ধকারে কাজ করলে বা বসে থাকলে চোখে ব্যথা অনুভব করেন। যেমন সিনেমা হলে অনেকক্ষণ বসে থাকার দরুন কিংবা ডার্করুমে এক্সরে বিভাগে বেশি সময় ধরে কাজ করলে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে এরকম ব্যথা হতে পারে। কিন্তু সব মানুষের হয় না। একমাত্র যাদের চোখের সামনের চেম্বার স্বল্পগভীর (Shallow anterior chamber) তাদেরই এরকম উপসর্গ দেখা দেয়। এমন কি এদের অনেকের হঠাৎ করে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা রোগের উৎপত্তি হয়ে যেতে পারে।

অন্ধকারে বা অল্প আলোতে চোখের পিউপিল আকারে বড় হয় এবং আইরিসের প্রান্ত গিয়ে সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে অ্যাকুয়াস নির্গমনের পথকে বন্ধ করে দেয় ফলে চোখের চাপ বেড়ে যায় ও চোখে ব্যথা অনুভূত হয়। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে এলে পিউপিল ছোট হয়ে আবার অ্যাঙ্গেল খুলে যায় ও উপসর্গ ভালো হয়ে যায়।

এই কারণে যাদের অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয় তাদেরকে ডার্ক রুম টেষ্ট (Dark Room Test) নামক একটি পরীক্ষা করা হয়। রোগীকে অন্ধকার ঘরে উপুড় করে শোয়ানো হয় এবং ১৫ মিনিট পর পর ৫/৬ বার চোখের চাপ মাপা হয়। যদি কারও চাপ প্রথম বারের চাইতে ৮ মিঃ মিঃ মারকারি বা এর অধিক বেড়ে যায় তাহলে তার অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা হতে পারে বলে ধরা হয় এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

www.banglainternet.com

Goto List >

পড়াশুনা সেলাই টি. ভি. এবং গ্লুকোমা

অল্প আলোতে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা, সেলাই করলে বা টেলিভিশন দেখলে ঐ একইভাবে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার সূত্রপাত হতে পারে। আগেই বলেছি যাদের চোখে স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার তাদেরই এরকমটি হতে পারে। সব মানুষের এই অসুবিধা হয় না। সুতরাং একমাত্র যারা অন্ধকার বা অল্প আলোতে কাজ করার সময় চোখে বা মাথায় ব্যথা অনুভব করেন তারা চক্ষু চিকিৎসককে দেখিয়ে গ্লুকোমা আছে কি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।

www.banglainternet.com

গ্লুকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর ওষুধ

অন্ধকারে যেমন চোখের পিউপিল বড় হয়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার সূত্রপাত হতে পারে তেমনি যে সকল ওষুধ পিউপিলকে বড় করে যেমন এট্রপিন চোখের ড্রপ, পেটে ব্যথার জন্য ব্যবহৃত ব্যালাডোনা বা এই জাতীয় ট্যাবলেট ও ওষুধ ঐ ধরনের অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার সৃষ্টি করতে পারে।

আগেও বলেছি রক্তের চাপ অতিমাত্রায় হ্রাস পেলে অপটিক নার্ভের অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় এবং তাতে নার্ভের ক্ষতি হলে দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। সুতরাং যেসব ওষুধ রক্তের চাপ খুব কমিয়ে দেয় তা গ্লুকোমা রোগীর জন্য ক্ষতিকর।

অনেক রোগীর স্টেরয়েড জাতীয় চোখের ড্রপ, মলম বা ট্যাবলেট, ব্যবহার করার ফলে চোখের চাপ বেড়ে যায়। যাদের বংশগত পূর্ব প্রবণতা রয়েছে তাদেরই শুধু এই ওষুধে চোখের চাপ এমনকি রক্তের চাপও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত ২ সপ্তাহের বেশি এই ওষুধ ব্যবহার করলেই চাপ বাড়তে পারে এবং অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার ন্যায় রোগীর অজান্তেই চোখের ক্ষতি হতে থাকে। সুতরাং যেসব রোগীকে অনেকদিন ধরে স্টেরয়েড ড্রপ বা মলম ব্যবহার করতে হবে, তাদেরকে ঘন ঘন পরীক্ষা করে অপটিক ডিস্কের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না, বা চোখের চাপ বাড়ছে কি না তা দেখতে হবে।

www.banglainternet.com

চোখের ছানি ও গ্লুকোমা

চোখের ছানি ও গ্লুকোমা উভয় রোগেই চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যার ফলে গ্লুকোমার কারণে দৃষ্টি কমতে থাকলেও অনেকে চোখের ছানি ভেবে ভুল করে থাকেন। ছানি অনেকের কাছেই পরিচিত একটি চোখের অসুখ। এটা পাকতে সময় লাগে এবং এর অপারেশন করে চিকিৎসা করা হয়। অনেকে এক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে গ্লুকোমাকে ছানি মনে করে তা পাকার জন্য অপেক্ষা করে এবং যখন রোগী প্রায় অন্ধ হয়ে যান তখন ছানি পেকে গেছে ভেবে চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য আসেন। এই অবস্থায় সত্যি যদি ছানি রোগ হয় তাহলে তার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু রোগী যদি গ্লুকোমাতে ভুগে অন্ধ হয়ে যায় তা হলে তার আর চিকিৎসা নেই। অথচ এই রোগী যদি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের কাছে আসতেন তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার পর চিকিৎসা করা যেত ও অন্ধত্ব এড়ানো সম্ভব হতো।

www.banglainternet.com

দেশে-বিদেশে গ্লুকোমার প্রভাব

গ্লুকোমা এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই গ্লুকোমা অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ। পয়ত্রিশোর্ধ মানুষের মধ্যে শতকরা ২ ভাগ মানুষ এই রোগে ভুগে থাকেন। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হলেন প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা (POAG) রোগী।

বাংলাদেশের উপজাতীয় এবং মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের (Eskimo) মধ্যে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার প্রভাব খুব বেশি। সাদা চামড়ার লোকদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার প্রভাব বেশি।

সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে অন্ধত্বের তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই গ্লুকোমা। আমাদের দেশে ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এ অবস্থা আরও মারাত্মক। আগেই বলেছি গ্রাম-গঞ্জের বহু রোগী চোখে কম দেখলে চোখে পর্দা বা ছানি (Cataract) মনে করেন এবং কবে এই পর্দা পরিপক্ক হবে (Mature cataract) সেই আশায় অপেক্ষা করেন। যখন তিনি একেবারে কম দেখেন তখন হয়তো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন। তার যদি সৌভাগ্যবশত ছানিই হয়ে থাকে তাহলে তার ভালো চিকিৎসা হবে। কিন্তু তিনি যদি ছানি না হয়ে গ্লুকোমার কারণে কম দেখেন তাহলে দুর্ভাগ্যবশত ঐ চোখের আর কোন ভালো চিকিৎসা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে ব্যাপক জরিপ করা গেলে হয়তো সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হবে শতকরা কতজন মানুষের এই কঠিন চোখের ব্যাধি রয়েছে।

www.banglainternet.com

Goto List >

গ্লুকোমা রোগী ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য

গ্লুকোমা কতটা কঠিন চোখের অসুখ তা আর দশজন মানুষের চেয়ে একজন গ্লুকোমা রোগীই ভালো বোঝেন। তাই এই রোগটি বুঝতে না পারা বা অসচেতনতার কারণে কেউ যাতে অপূরনীয় ক্ষতির শিকার না হন, সেজন্য একজন গ্লুকোমা রোগী যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন। তার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আশপাশের লোকজনকে জানালে তারা সহজেই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন। এর ফলে বহু গ্লুকোমা রোগ সঠিক সময়ে নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়াও সম্ভব হবে। পরোক্ষভাবে গ্লুকোমার কারণে অন্ধত্ব প্রতিরোধে এটি একটি অন্যতম পদক্ষেপ হতে পারে। গ্লুকোমা যেহেতু অনেকক্ষেত্রে বংশগতভাবে বিস্তার লাভ করে, সেজন্য একজন গ্লুকোমা রোগীর রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়-স্বজনের চক্ষু পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে গ্লুকোমা-প্রবণতা আছে কি নেই দেখা উচিত। এ ব্যাপারেও একজন রোগী যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারেন।

www.banglainternet.com

Goto List >

গ্লুকোমা রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা

গ্লুকোমা রোগনির্ণয়ের জন্য চোখের সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ কয়েকটি পরীক্ষার প্রয়োজন, যেমন-

(ক) চোখের চাপ নির্ণয়

(খ) অপটিক ডিস্ক-এর পরীক্ষা

(গ) দৃষ্টির পরিসীমা পরীক্ষা

(ঘ) গোনিওস্কোপি বা সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল পরীক্ষা।

(ক) চোখের চাপ (Intra Ocular Pressure, I.O.P.) নির্ণয়

স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের চাপ ১১ মিঃ লিঃ মারকারি থেকে ২১ মিঃ মিঃ মারকারির মধ্যে থাকে। চোখের চাপ মাপার পদ্ধতিকে বলা হয় **টনোমেট্রি** (Tonometry)। চক্ষুচিকিৎসকগণ অনেক সময় চোখের ওপরের পাপড়ির ওপরে দুটি আঙ্গুল দিয়ে চোখের চাপ পরীক্ষা করে থাকেন। এতে সঠিক চাপ জানা না গেলেও খুব বেশি বা কম চাপ থাকলে সহজেই বোঝা যায়। সঠিকভাবে ও সূক্ষ্মভাবে (Quantitative) চাপ মাপার জন্য চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এর কয়েকটি সম্পর্কে বলা হল।

(১) শিওটজ টনোমিটার (Schiotz Tonometer)

ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই যন্ত্রের প্লাঞ্জার নামক নিচের অংশটিকে চোখের কর্নিয়ার ওপর বসানো হয়। প্লাঞ্জারটি কর্নিয়াকে কতটুকু গর্ত করবে (Indentation) তা ঐ চোখের চাপের ওপর নির্ভর করে। এবং সেই অনুযায়ী এই যন্ত্রে স্কেলের কাঁটা সরে যায়। যন্ত্রের সঙ্গে দেয়া একটি কাগজে স্কেলের রিডিং কত হলে চোখের চাপ কত হবে তার একটি তালিকা থাকে — এ থেকে মোটামুটি সঠিক চোখের চাপ বুঝা যায়।

www.banglainternet.com

এই যন্ত্রটি সস্তা, সহজেই ব্যবহার করা যায়, যেকোন স্থানে বহণযোগ্য এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে চোখের চাপ মাপার জন্য। এটি ব্যবহারের জন্য স্লিট ল্যাম্পের প্রয়োজন হয় না বলে যেখানে বিদ্যুৎ

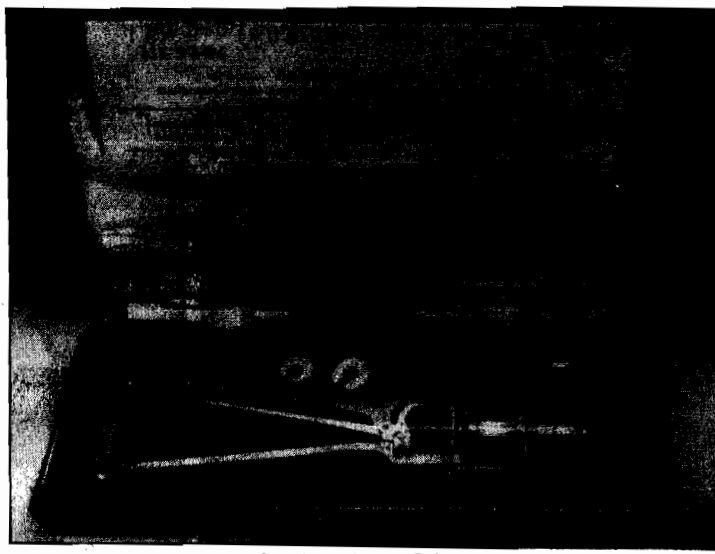

শিওটজ টনোমিটার

শিওটজ টনোমিটারের সাহায্যে চোখের চাপ মাপা হচ্ছে

www.banglainternet.com

নেই সেসব এলাকাতে গিয়েও চোখের চাপ মাপা যায়। আমাদের দেশে চোখের চাপ মাপবার জন্য এই টনোমিটার বেশি ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই পদ্ধতিতে চোখের চাপ মাপাকে ইনডেনটেশন টনোমেট্রি (Indentation tonometry) বলা হয়।

(২) অ্যাপলানেশন টনোমিটার (Applanation Tonometer)

ছবিতে গোল্ডম্যান অ্যাপলানেশন টনোমিটার দেখা যাচ্ছে। এটিকে স্লিট ল্যাম্পে বসিয়ে রোগীর চোখের চাপ মাপা হয়। এই পদ্ধতিতে বর্তমানে সবচাইতে সঠিকভাবে চোখের চাপ মাপা যায়।

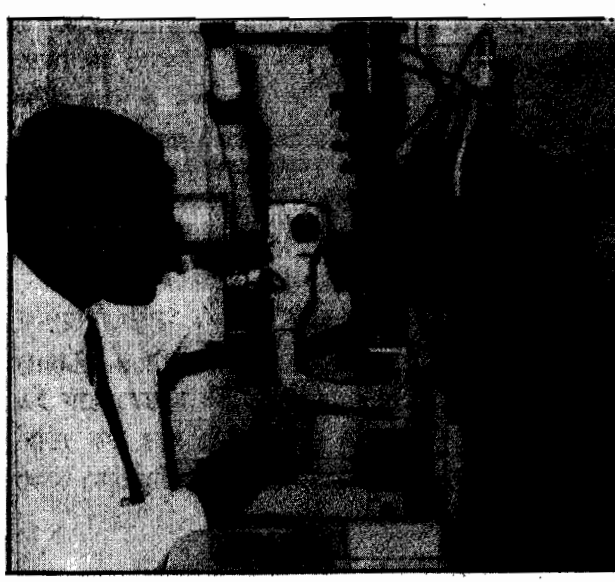

www.banglainternet.com

এই যন্ত্রটির সামনে একটি ডাব্‌ল প্রিজম রয়েছে যা কর্নিয়ার ওপর মাত্র ৩.০৬ মিঃ মিঃ স্পর্শ করে। এই প্রিজম এর সাহায্যে কর্নিয়াকে চ্যাপ্টা করে (Applanation) চোখের চাপ মাপা হয়। এই পদ্ধতিতে চোখের চাপ মাপাকে বলা হয় অ্যাপলানেশন টনোমেট্রি (Applanation Tonometry)।

বর্তমানে গোল্ডম্যান অ্যাপলানেশন টনোমিটার ছাড়াও আরও কয়েকটি অ্যাপলানেশন টনোমিটার দিয়েও চোখের চাপ মাপা হয়। এগুলিতে স্লিট ল্যাম্পের প্রয়োজন হয় না। যেমন

(১) পারকিন্স হাতে ধরা টনোমিটার (Perkins hand-held tonometer).

(২) অস্পর্শ বায়ুযুক্ত টনোমিটার (Non-contact air tonometer)

www.banglainternet.com

Goto List >

(খ) অপটিক ডিস্ক (Optic Disc)-এর পরীক্ষা

ডান পাশের ছবির রেখা চিত্র

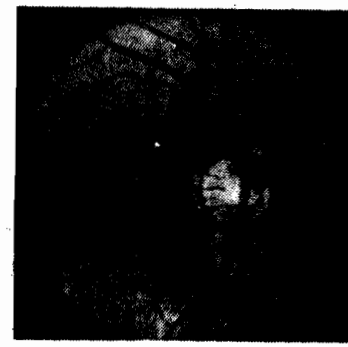

চোখের স্বাভাবিক ফান্ডাস

ছবিতে ফান্ডাস (Fundus) বা রেটিনার যে অংশ অপথালমোস্কোপি পরীক্ষায় দেখা যায় তা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানের গোল অংশটির নাম অপটিক ডিস্ক্। অপটিক নার্ভ এখান থেকে শুরু। এই অপটিক ডিস্কের মাঝে আর একটি ছোট গর্ত (cup) রয়েছে যার নাম অপটিক কাপ। সাধারণত এই কাপ ও ডিস্কের অনুপাত ০.২ থেকে ০.৪ এর মধ্যে। এটাকে ফিজিওলজিকাল কাপ ডিস্ক অনুপাত ধরা হয়। চোখের চাপ বেড়ে গেলে অর্থাৎ গ্লুকোমাতে এই কাপ ডিস্কের অনুপাত বেড়ে গিয়ে ০.৬, ০.৭ ইত্যাদি এমনকি ১.০ অর্থাৎ ডিস্কের পুরাটাই কাপ হয়ে যেতে পারে। এই কাপ-ডিস্কের অনুপাত দেখে অপটিক নার্ভের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা অনুমান করা যায়।

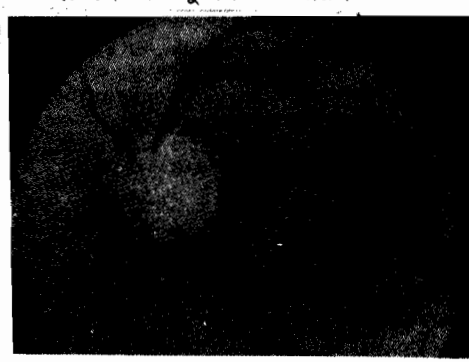

গ্লুকোমা রোগে অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন। এখানে কাপ ও ডিস্কের অনুপাত ০.৮

www.banglainternet.com

Goto List >

(গ) দৃষ্টির পরিসীমা (Field of Vision, Perimetry) **পরীক্ষা**

গ্লুকোমা রোগনির্ণয়ের জন্য দৃষ্টির পরিসীমা মাপা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার গ্লুকোমাতে দৃষ্টির পরিসীমার নানারকম পরিবর্তন হতে দেখা যায়।

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমাতে প্রথমেই কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমা-এর (Central field of vision) পরিবর্তন হতে দেখা যায় এবং রোগের শেষ দিকে পার্শ্বীয় দৃষ্টির পরিসীমাতে (Peripherial field of vision) পরিবর্তন আসে।

অপটিক ডিস্কে পরিবর্তন পাওয়া গেলে এই পরীক্ষাটি করা উচিত এবং এর সাহায্যে রোগীর দৃষ্টির কতটা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা বোঝা যাবে। নিচের ছবিগুলিতে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টির পরিসীমা নির্ণয় করা হচ্ছে।

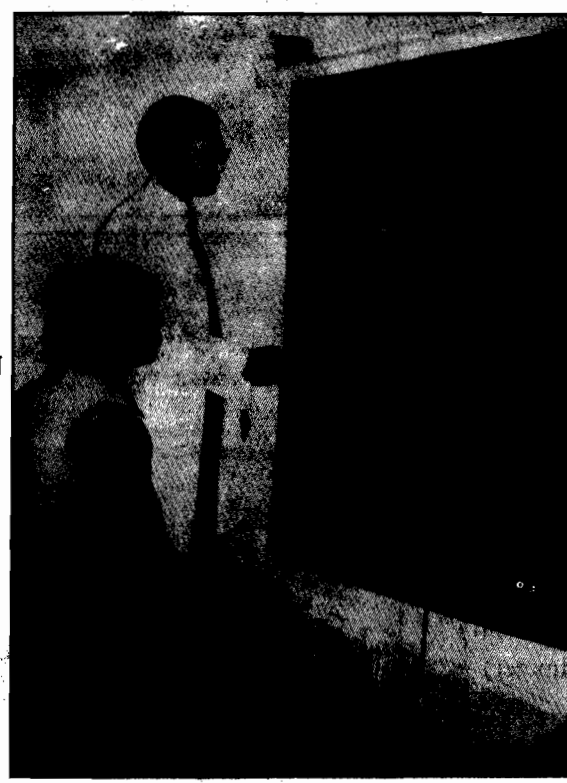

কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমা মাপার যন্ত্র জেরামস্ স্ক্রীন — (Bjerrum's Screen)

www.banglainternet.com

পার্শ্বীয় দৃষ্টির পরিসীমা মাপার যন্ত্র লিস্টার পেরিমিটার ... (Lister Perimeter)

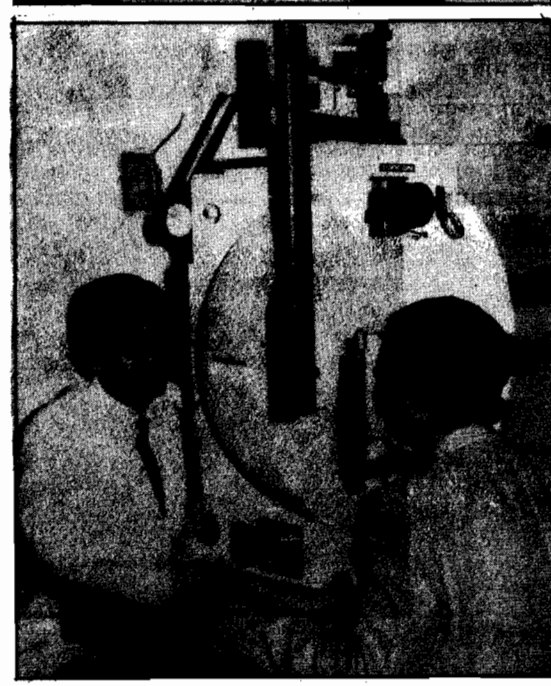

কেন্দ্রীয় ও পার্শ্বীয় দৃষ্টির পরিসীমা মাপার যন্ত্র — গোল্ডম্যান পেরিমিটার (Goldmann / Perimeter)

www.banglainternet.com

Goto List >

অত্যাধুনিক অক্টোপাস পেরিমিটার (Autatomated Octopus Perimeter)

(ঘ) গোনিওস্কোপি (Gonioscopy).

ছবিতে গোনিও লেন্স নামক একটি লেন্স কর্নিয়ার ওপর বসিয়ে এবং স্লিট ল্যাম্প মাইক্রোসকোপের সাহায্যে চোখের সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল দেখা হচ্ছে।

www.banglainternet.com

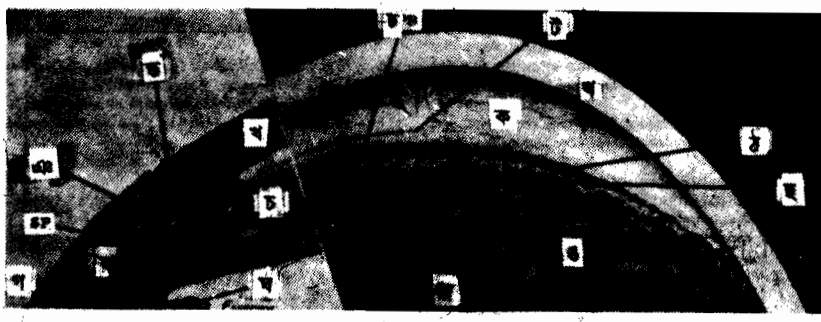

(ক) অ্যান্টেরিয়র চেম্বার (খ) কর্নিয়া (গ) সিলিয়ারি বডি (ঘ) সিলিয়ারি প্রসেস (ঙ) আইরিস (জ) পিউপিল (ঝ) [illegible]রা (ঞ) শ্লেম্‌স ক্যানাল (ট) শলবিজ লাইন (ঠ) ক্লেরাল স্পার (চ) ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক

বামে - স্বাভাবিক অ্যান্টেরিয়র চেম্বার অ্যাঙ্গেল

ডানে-গোনিওস্কোপ-এর সাহায্যে অ্যান্টেরিয়র চেম্বার অ্যাঙ্গেল দেখা হচ্ছে

সাধারণত এই যন্ত্রের সাহায্যে অ্যাঙ্গেল দেখতে ওপরের ছবির মতো দেখা যায় । এই অ্যাঙ্গেল ০ ডিগ্রী থেকে ৪০°—৪৫° ডিগ্রী পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং সে অনুসারে সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলকে মোট ৫টি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। অ্যাঙ্গেলটি কোন গ্রেডের তা দেখে গ্লুকোমার সঠিক প্রকার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন ২০° থেকে ৪৫° এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হলে এবং চোখের চাপ বেড়ে গেলে তাকে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা বলা হয়। আবার ২০° এর নিচে ১০° বা ০° অ্যাঙ্গেল হয়ে চাপ বেড়ে গেলে তাকে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা বলে। অ্যাঙ্গেলে অনেক সময় পিগমেন্ট, রক্তের নালী, বা অন্য কোন বস্তু আটকে থেকে চোখের চাপ বাড়াতে পারে ও সেকেন্ডারি গ্লুকোমা হতে পারে।

গোনিও লেন্সের সাহায্যে এভাবে অ্যাঙ্গেল দেখার পদ্ধতিকে বলা হয় গোনিওস্কোপি।

www.banglainternet.com

জন্মগত গ্লুকোমা
(Congenital Glaucoma)

এই রোগটি শিশুদের মারাত্মক একটি চোখের রোগ হলেও এর হার খুব কম। প্রতি দশ হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় একটি শিশুর জন্মগত গ্লুকোমা হয়। এই রোগটির বংশগত সম্পর্ক আছে। শতকরা ৬৫ ভাগ ছেলে শিশুর এবং বাকী ৩৫ ভাগ মেয়ে শিশুর এই গ্লুকোমা হয়ে থাকে। শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে দুই চোখই আক্রান্ত হয়। যদিও দুইটি চোখে রোগের মাত্রা কম বেশি থাকতে পারে।

কারণ

এই গ্লুকোমার সঠিক কারণ জানা যায় না। তবে কয়েকটি তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়, যেমন —

১। সামনের চেম্বার এর অ্যাঙ্গেলের ওপর দিয়ে একটি ঝিল্লি বা মেমব্রেন থাকতে পারে, এটি অ্যাকুয়াস নির্গমনে বাধা দেয়।

২। শ্লেমস ক্যানাল সরু থাকতে পারে, এমন কি অনুপস্থিত থাকতে পারে।

লক্ষণ

১। চোখের চাপ বাড়ার ফলে কর্নিয়াতে পানি জমে ঘোলা হয়ে যায়। শিশুর বাব-মা সাধারণত এই লক্ষণটিই প্রথম দেখে থাকেন।

২। চাপ বাড়ার ফলে শিশুর চোখ বড় হয়ে যায়। শিশুর বয়স তিন বছর বা তার আগে চাপ বাড়লে কর্নিয়া ও স্ক্লেরা বড় হয়ে গরুর চোখের মতন বড় দেখায়। এই চোখকে বলা হয় বুফথ্যালমাস (Buphthalmos)।

৩। চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়তে পারে।

৪। আলোভীতি হতে পারে। কর্ণিয়ায় পানি জমার ফলে শিশু আলোর দিকে তাকাতে পারে না। অনেক শিশু এই অবস্থায় প্রায় সারাদিনই আলোতে চোখ বন্ধ করে থাকে।

www.banglainternet.com

Goto List >

৫। চোখে কম দেখা— অনেক সময় বাবা-মা লক্ষ্য করে থাকেন তাদের সন্তান চোখে কম দেখছে।

(চ)

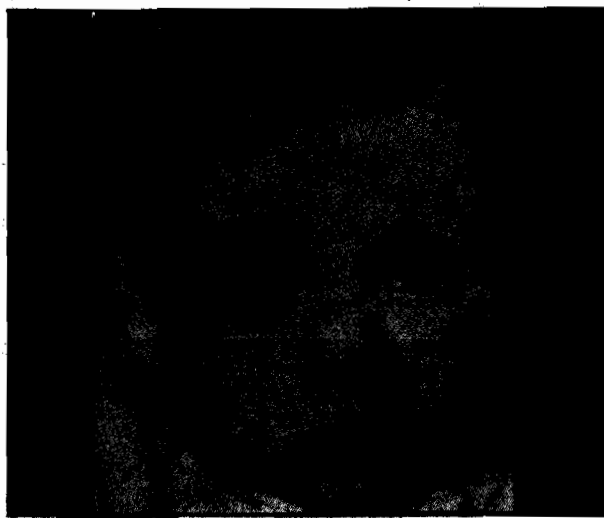

বৃহৎকনীনা (জন্মগত গ্লুকোমা)

ছবিতে বাম চোখের তুলনায় ডান চোখ এবং এর কর্নিয়াকে বড় দেখা যাচ্ছে।

পরীক্ষা করলে দেখা যায়

১। কর্নিয়া ১২ মিঃ মিঃ থেকে বেশি বড় হতে পারে এবং কর্নিয়াতে দাগ থাকতে পারে।

২। সামনের চেম্বার খুব গভীর দেখায়।

৩। চোখের চাপ অনেক বেশি থাকে ও ডিস্কে কাপিং থাকে (শিশুকে অজ্ঞান করে এসব পরীক্ষা করা হয়)।

৪। বিশেষ ধরনের গোনিও লেন্সের সাহায্যে গোনিওস্কোপি করা হলে রোগের কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং চিকিৎসার সুবিধা হয়।

চিকিৎসা

জন্মগত গ্লুকোমাতে ওষুধ দিয়ে কোন লাভ হয় না। অপারেশন করেই চিকিৎসা করা হয়। তবে রোগের কোন অবস্থা তা বিবেচনা করে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের কাছে আসলে গোনিওটমি, গোনিওপাংচার, ট্রাবিকুলেকটমি বা গ্লুকোমা ভাল্‌ভ ইমপ্লান্ট ইত্যাদি

www.banglainternet.com

Goto List >

অপারেশন করা যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার জন্য খুব দেরি করে আসলে এবং চোখের দৃষ্টি একেবারে না থাকলে অপারেশনের পরিবর্তে চোখের চাপ কমাবার ওষুধ দেয়া হয়ে থাকে।

কোন কোন সময় শিশুর চোখে খুব ব্যথা হয় কিংবা উচ্চচাপের ফলে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে — এসব ক্ষেত্রে চোখ তুলে ফেলতে হতে পারে।

www.banglainternet.com

Goto List >

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা
(Primary Open Angle Glaucoma, POAG)

পয়ত্রিশোর্ধ নারী-পুরুষের প্রতি ২০০ জনের মধ্যে অন্তত একজন এধরনের গ্লুকোমায় ভুগে থাকেন। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে অন্ধত্বের শতকরা ২০ ভাগ কারণ এই ধরনের গ্লুকোমা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগটি বংশাণুক্রমিক। রোগীর অন্তত শতকরা ১০ ভাগ নিকটাত্মীয় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

উপসর্গ

প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার কোন উপসর্গ হয় না। আস্তে আস্তে অপটিক ডিস্কের ক্ষতি হয়ে দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায় এবং রোগী দৃষ্টিশক্তি হারায়।

পরীক্ষা

(১) *অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন* — রোগী কোন পর্যায়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন তার ওপর নির্ভর করে, অপটিক ডিস্কের পরিবর্তন। অপটিক ডিস্কের পরিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় কাপ-ডিস্কের অনুপাত ০.৪ থেকে ০.৫ এর মধ্যে থাকে এবং পরে তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং শেষে এই অনুপাতে ১.০-এ দাঁড়ায়।

(২) *চোখের চাপ* — চোখের চাপ সাধারণত ২৫ থেকে ৩৫ মিঃ মিঃ মারকারির মধ্যে পাওয়া যায় এবং ৪০-৫০ মিঃ মিঃ মারকারির বেশি চোখের চাপ বাড়ে না।

(৩) *গোনিওস্কোপি* — এই পরীক্ষায় সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল ২০ থেকে ৪৫° পর্যন্ত থাকে অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল খোলা থাকে।

www.banglainternet.com

(৪) *দৃষ্টির পরিসীমা* — কাপ-ডিস্কের পরিবর্তন অনুসারে দৃষ্টির পরিসীমার পরিবর্তন দেখা যায়। কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমায় অন্ধ-বিন্দুর বড় হওয়া, জেরামস্ স্কোটমা, আইসোলেটেড প্যারাসেন্ট্রাল স্কোটমা, আরকুয়েট স্কোটমা, ডাবল আরকুয়েট স্কোটমা, ইত্যাদি নানা ধরনের পরিবর্তন দেখে চিকিৎসকগণ দৃষ্টির পরিসীমার ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন।

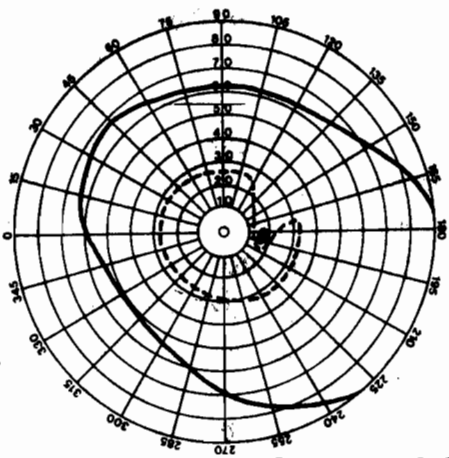

অন্ধবিন্দু বড় হয়ে কেন্দ্রীয় দৃষ্টির পরিসীমার পরিবর্তন

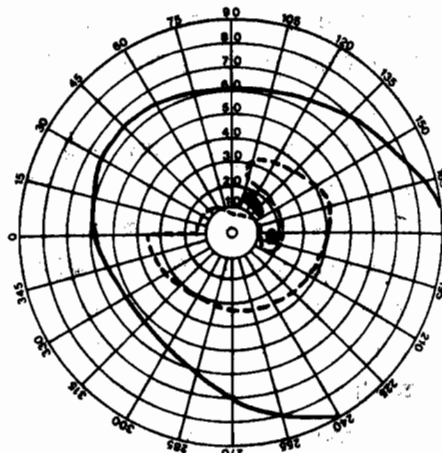

প্যারাসেন্ট্রাল স্কোটমা

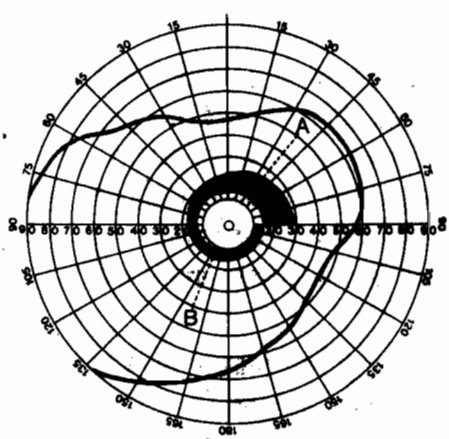

আরকুয়েট স্কোটমা

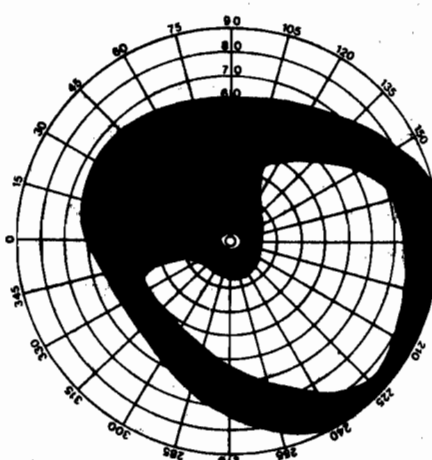

ডাবল আরকুয়েট স্কোটমা

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমাতে দৃষ্টির পরিসীমার বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তন।

www.banglainternet.com

চিকিৎসা

সাধারণত তিন ভাবে চিকিৎসা করা যায় (ক) **ওষুধের সাহায্যে** (খ) **লেজার চিকিৎসা** (গ) **অপারেশন**

(ক) ***ওষুধের সাহায্যে*** — প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার চিকিৎসা মূলত ওষুধ ব্যবহার করেই করা হয়ে থাকে। এ রোগটি ওষুধে স্থায়ীভাবে ভালো হয় না কিন্তু চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, ঠিক রক্তের উচ্চচাপের মতো। সারা জীবন এই রোগের জন্য ওষুধ ব্যবহার করে চোখের চাপ স্বাভাবিক রাখা হয়।

চোখের ড্রপ টিমোলোল, পাইলোকার্পিন এবং খাবার ওষুধ কার্বোনিক এনহাইড্রেজ ইনহিবিটর যেমন এসিটাজোলামাইড, মূলত এই ৩টি ওষুধ ব্যবহার করেই এই গ্লুকোমার চিকিৎসা করা যায়। প্রথমে একটি ওষুধ যেমন টিমোলোল ড্রপ ০.৫% দিনে দুইবার চোখে ব্যবহার করলে অনেকেরই চোখের চাপ স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই ওষুধটি অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি কমিয়ে দেয়। যেসব রোগীর হাঁপানি রোগ বা হার্টের অসুখ আছে তাদেরকে অবশ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে এই ওষুধ দেয়া হয় না।

যাদের একটি ওষুধে কাজ হয় না তাদেরকে টিমোলোলের সঙ্গে পাইলোকার্পিন ড্রপ কিংবা এসিটাজোলামাইড ট্যাবলেট দেয়া হয়। এই ট্যাবলেটেরও অনেক জটিলতা আছে। সবদিক বিবেচনা করে চক্ষু চিকিৎসকগণ এই গ্লুকোমার চিকিৎসা করে থাকেন।

(খ) ***লেজার চিকিৎসা***— যাদের ওষুধ ব্যবহার করে চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে না তাদের জন্য আরগন লেজার ট্রাবিকুলোপ্লাস্টি (Argon Laser Trabeculoplasty, ALT) নামক এক ধরনের লেজারের সাহায্যে চিকিৎসা করা যেতে পারে। শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা চোখের চাপ কমিয়ে দেয়। যদিও কিছু কিছু রোগীর চোখের চাপ কয়েক মাসের মধ্যে আবার বেড়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে এই ধরনের চিকিৎসা এখনও শুরু হয় নি।

(গ) ***অপারেশন*** — ওষুধ দিয়ে যদি রোগীর গ্লুকোমা নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় অর্থাৎ চোখের চাপ ২১ মিঃ মিঃ মারকারির নিচে না থাকে কিংবা দৃষ্টির পরিসীমা কমতে থাকে তাহলে অপারেশন করে চোখের চাপ কমানো হয়। এই অপারেশনে চোখের সামনের চেম্বারের সঙ্গে কনজাংটিভার নিচের একটি সংযোগ তৈরি করা হয়। ফলে অ্যাকুয়াস সামনের চেম্বার থেকে সরাসরি কনজাংটিভার বা পাতলা স্ক্লেরার নিচে প্রবাহিত হয়ে চোখের চাপ কমিয়ে

www.banglainternet.com

Goto List >

দেয়। এই অপারেশনের নাম ফিলট্রেশন সার্জারি (Filtration surgery) — যা কয়েকভাবে করা সম্ভব। তবে এধরনের আধুনিক এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ফিলট্রেশন সার্জারি হচ্ছে ট্রাবিকুলেকটমি (Trabeculectomy).

অপারেশন ও উন্নয়নশীল দেশ

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার চিকিৎসা হিসেবে প্রথমেই অপারেশন করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ ;

১। গ্লুকোমা চিকিৎসার ওষুধ বেশ দামী ;

২। অনেক সময় সব ওষুধ পাওয়া যায় না ;

৩। রোগী নিয়মিত ব্যবহার না-ও করতে পারেন ;

৪। সারাজীবন ব্যবহার করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না ;

৫। একবার অপারেশন করলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর সাধারণত বাকি জীবনে ওষুধ ছাড়াই চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকে। বাকি শতকরা ২০ ভাগ রোগী অপারেশনের পর মাত্র একটি ওষুধ ব্যবহার করে ভালো থাকেন।

www.banglainternet.com

Goto List >

অকুলার হাইপারটেনশন
(Ocular Hypertension)

অনেক মানুষের চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি থাকতে পারে কিন্তু এদের পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় অপটিক ডিস্কের কাপ-ডিস্ক অনুপাত স্বাভাবিক এবং দৃষ্টির পরিসীমাও স্বাভাবিক তাহলে তাদেরকে বলা হয় অকুলার হাইপারটেনশন। এসব রোগীর কেউ কেউ ভবিষ্যতে অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা রোগীতে রূপান্তরিত হতে পারে বিধায় এদেরকে 'গ্লুকোমা সাসপেক্ট' (Glaucoma Suspect) বলা হয়। এসব রোগীকে ওয়াটার ড্রিংকিং টেস্ট (Water Drinking Test) করে যদি পজিটিভ পাওয়া না যায় তাহলে অন্তত বছরে একবার পরীক্ষা করলেই চলে। কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঐ একটু বেশি চোখের চাপ হয়তো ঐ চোখের জন্য স্বাভাবিক এবং তা অপটিক নার্ভের জন্য ক্ষতিকর নয়।

চিকিৎসা

অকুলার হাইপারটেনশনের রোগীদেরকে সাধারণত কোন চিকিৎসা দেবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ফলো আপ পরীক্ষাতে অপটিক নার্ভ বা দৃষ্টির পরিসীমার কোন পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার ন্যায় চিকিৎসা করাতে হবে।

www.banglainternet.com

Goto List >

লো টেনশন গ্লুকোমা
(Low Tension Glaucoma)

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার মতো এটি এক ধরনের গ্লুকোমা যেখানে অপটিক নার্ভ ও দৃষ্টির পরিসীমায় প্রমাণিত পরিবর্তন দেখা যায় কিন্তু চোখের চাপ স্বাভাবিক অর্থাৎ ২১ মিঃ মিঃ মারকারির কম থাকে। এজন্য এধরনের গ্লুকোমাকে নরমাল টেনশন গ্লুকোমাও বলা হয়ে থাকে। চোখের চাপ কম থাকলেও কেন গ্লুকোমা হয় এ নিয়ে অনেক মতভেদ ও তত্ত্ব (Theory) আছে। অনেকের মতে, কিছু মানুষের স্বাভাবিক মাত্রার চোখের চাপও ঐ বিশেষ চোখটির জন্য বেশি এবং অপটিক নার্ভের পরিবর্তন করতে সক্ষম।

অনেকে মনে করেন, ঐ রোগীর জীবনে জন্মের সময় বা পরে কোন এক সময়ে রক্তের চাপ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় চোখের ভেতরে ও অপটিক নার্ভে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করেছিল। ফলে তার চোখের কাপ-ডিস্ক অনুপাত বেড়ে যায় এবং দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায়। পরবর্তীকালে রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়ে যাবার ফলে বিনা ওষুধেই চোখের চাপ স্বাভাবিক বা কম থাকে।

অন্য এক তত্ত্ব অনুযায়ী রোগীর চোখের চাপ যখন মাপা হয় তখন হয়তো স্বাভাবিক থাকে কিন্তু দিনে বা রাতে কোন এক সময়ে চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় এবং অপটিক নার্ভের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে লো টেনশন গ্লুকোমা রোগীদের প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর মোট ২৪ ঘন্টা চোখের চাপ মাপা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার নাম ফেজিং (Phasing)। এই পরীক্ষায় যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ সময়ে রোগীর চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে এতে রোগনির্ণয়সহ চিকিৎসারও সুবিধে হয়। দিন-রাতের ঠিক যে সময়টিতে ঐ চাপ বেড়ে যায় তার এক ঘণ্টা আগে চোখের চাপ কমাবার ড্রপ দিলে চাপ স্বাভাবিক থাকবে এবং চোখের পুনরায় ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে। রোগনির্ণয় হয়ে গেলে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার অনুরূপ অপারেশন করেও এই রোগটির চিকিৎসা করা যেতে পারে। এ রোগে সাধারণত চোখের চাপ ১২ মিঃ মিঃ মারকারি বা তার চেয়ে কম রাখার চেষ্টা করা হয়।

www.banglainternet.com

Goto List >

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা
(Primary Angle Closure Glaucoma, PACG)

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা চোখের একটি জরুরী রোগ। চল্লিশোর্ধ বয়সের প্রতি ১০০০ মানুষের প্রায় একজন এই রোগে ভুগে থাকেন। মহিলাদের এই রোগ পুরুষের চাইতে অন্তত চারগুণ বেশি হয়। অনেকক্ষেত্রেই রোগটি বংশগত এবং দুই চোখই আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সেজন্য একটি চোখের অসুখ ধরা পড়লে আপাত ভালো অন্য চোখেরও চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

এই ধরনের গ্লুকোমার উপসর্গ খুব সহজেই বোঝা যায়, ফলে রোগী সাধারণত দ্রুত চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এই রোগের উপসর্গ এতই স্পষ্ট যে কোন কোন ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞ টেলিফোনে রোগের বিবরণ শুনেই রোগনির্ণয় করতে পারেন।

কাদের বেশি হয়

অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা কয়েকটি বিশেষ ধরনের চোখে বেশি হয়, যেমন, ছোট আকারের চোখ। এই চোখের বৈশিষ্ট হল :

১। চোখের সামনে-পেছনের দূরত্ব কম থাকায় আইরিস, লেন্স, ডায়াফ্রাম সামনের দিকে থাকে,

২। স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার,

৩। সরু সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেল,

৪। তুলনামূলকভাবে চোখের লেন্স বড়,

৫। চোখের কর্নিয়ার আকার ছোট,

৬। হাইপারমেট্রপিয়া বা চোখে বেশি প্লাস পাওয়ারের দরকার হয়।

ছোট আকারের চোখে এসব বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে সামনের চেম্বারের অ্যাঙ্গেলে অ্যাকুয়াস নির্গমন কোন কোন সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং চোখের

www.banglainternet.com

চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মের সময় কখনও কখনও পিউপিল বড় হতে পারে। যেমন —

১। অন্ধকারে অনেক সময় কাটালে যেমন, সিনেমা হলে, আলোকচিত্রীদের অন্ধকার ঘরে ইত্যাদি স্থানে,

২। স্বল্প আলোয় পড়াশুনা, সেলাই করলে,

৩। দুশ্চিন্তায় বা ভয় পেলে,

৪। অন্ধকারে অনেকক্ষণ টেলিভিশন দেখলে,

৫। কোন কারণে চোখে এট্রপিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে।

আর এ ধরনের ছোট চোখে এসব সময়ে পিউপিল বড় হয়ে আইরিসের প্রান্ত গিয়ে অ্যাঙ্গেলকে আংশিকভাবে বন্ধ করে দিতে পারে।

এসব রোগী উজ্জ্বল আলোতে চলে আসলে বা ঘুমিয়ে পড়লে আবার পিউপিল ছোট হয়ে সামনের চেম্বারের অ্যাকুয়াস নির্গমনে সহায়তা করে ফলে সাময়িক বর্ধিত চোখের চাপ কমে যায়।

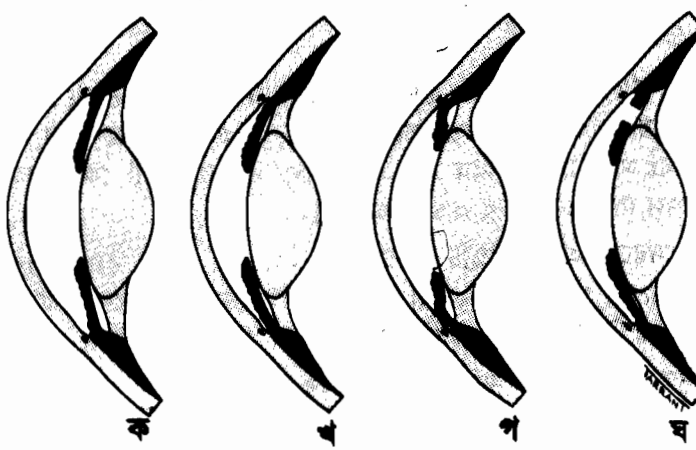

(ক) স্বাভাবিক সামনের চেম্বার ও স্বাভাবিক অ্যাঙ্গেল

(খ) স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার ও সরু অ্যাঙ্গেল

(গ) অন্ধকারে বা কোন কারণে পিউপিল বড় হয়ে আইরিসের প্রান্ত দিয়ে অ্যাঙ্গেলকে আংশিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

(ঘ) পেরিফেরাল আইরিডেকটমি করার পর আংশিক বন্ধ অ্যাঙ্গেল পুনরায় খুলে গেছে।

www.banglainternet.com

Goto List >

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার বিভিন্ন পর্যায়

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার উপসর্গও অবস্থা অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন —

১। সুপ্ত পর্যায়,

২। সবিরাম পর্যায়,

৩। অ্যাকুট কনজেস্টিভ পর্যায়,

৪। দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়,

৫। চূড়ান্ত পর্যায়।

১। সুপ্ত পর্যায় (Latent stage)

এই পর্যায়ে সাধারণত রোগীর কোন উপসর্গ থাকে না। চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু চোখ পরীক্ষা করলে স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার, লেন্স-আইরিস সামনে আগানো, ছোট কর্নিয়া এবং গোনিওস্কোপিতে গ্রেড ১ বা ২ অ্যাঙ্গেল দেখা যায়।

এ পর্যায়ের কোন রোগী পেলে ডার্ক রুম টেস্ট (Dark Room Test) অথবা মাইড্রিয়েটিক টেস্ট করা হয়। যদি চোখের চাপ এই পরীক্ষার আগে ও পরে ৮ মিঃ মিঃ মারকারির অধিক হয় — তাহলে এসকল রোগী কোন এক সময়ে অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমাতে আক্রান্ত হবেন।

এদেরকে একটি ছোট অপারেশন পি. পি. আই. (Prophylactic Peripheral Iridectomy) বা লেজার আইরডোটমি করলে সারা জীবনের জন্য আর ঐ গ্লুকোমা হবার ভয় থাকে না।

সুতরাং চল্লিশোর্ধ মহিলা ও পুরুষের বাৎসরিক চেক-আপের সময় এই গ্লুকোমার সুপ্ত পর্যায় নির্ণয় করা গেলে চোখের কোন ক্ষতি হবার আগেই চিকিৎসা সম্ভব হয়।

www.banglainternet.com

Goto List >

২। সবিরাম পর্যায় (Intermittent, subacute stage)

এই পর্যায়ে রোগীর মাঝে মধ্যে উপসর্গ হয়। এসকল রোগী অন্ধকারে বা অল্প আলোতে সেলাই, পড়াশুনা, টেলিভিশন দেখতে গিয়ে চোখে ও মাথায় ব্যথা অনুভব করেন। চোখের চাপ এসকল অবস্থায় বেড়ে যায়। কর্নিয়ায় পানি জমে এবং আলোর (বাতি) চারিদিকে রংধনুর ন্যায় বিভিন্ন রং দেখতে পারেন। উজ্জ্বল আলোতে বা ঘুমালে কিংবা এমনিতেই কোন চিকিৎসা ছাড়া ২/১ ঘণ্টার মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। বছরে বা মাসে ২/১ বার বা সপ্তাহে ২/১ বার এসকল উপসর্গ হতে পারে। অনেকের আরও ঘন ঘন এই উপসর্গ দেখা দিয়ে পরবর্তী অ্যাকুট পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

এই পর্যায়ে চোখের চাপ মাপলে সাধারণত ৪৫ মিঃ মিঃ মারকারির কম থাকে এবং অপটিক ডিস্কের কাপ স্বাভাবিক থাকে।

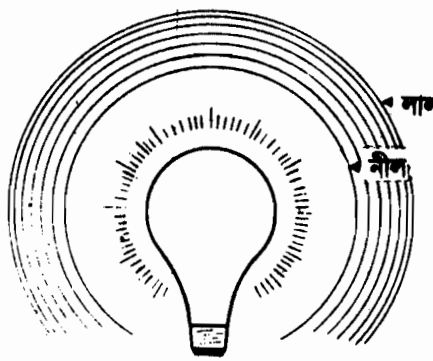

বাতির চারদিকে রংধনুর ন্যায় বিভিন্ন রং দেখা যাচ্ছে।

চিকিৎসা

ঠিক এই পর্যায়ে রোগী চিকিৎসকের কাছে এলে তার চোখে খুব ঘন ঘন পাইলোকার্পিন ফোটা দিয়ে চাপ কমানো হয় ও পরে দুই চোখেই পেরিফেরাল আইরিডেকটমি অপারেশন করা হয়ে থাকে।

কোন রোগী এই পর্যায়ের পরে এসে যদি এই রোগের বিবরণ দেন তাহলে তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করতে হবে ও চিকিৎসা করতে হবে।

www.banglainternet.com

৩। অ্যাকুট কনজেস্টিভ পর্যায় (Acute congestive stage)

অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার এই পর্যায়ের উপসর্গ অত্যন্ত স্পষ্ট যা রোগী না দেখে টেলিফোনে শুনেই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এই পর্যায়ের উপসর্গ হচ্ছে —

১। চোখে হঠাৎ অত্যধিক ব্যথা — সাধারণত এক চোখে ব্যথা হয়। এই ব্যথা পরে আস্তে আস্তে মাথার দিকে যায় এবং দাঁতেও হতে পারে।

২। চোখ লাল হয়ে যায় ও ফুলে ওঠে।

৩। দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এমনকি শুধু আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

৪। অনেকের বমি বমি ভাব কিংবা বমিও হতে পারে।

পরীক্ষা করলে দেখা যায়

১। কর্নিয়াতে পানি জমে ঘোলা হয়ে যায়।

২। কর্নিয়ার চারিধারে বেশি লাল বা সিলিয়ারি কনজেশন।

৩। খুবই স্বল্প গভীর সামনের চেম্বার।

৪। পিউপিল খাড়াখাড়িভাবে বড় হয় এবং আলোতে সংকুচিত হয় না।

৫। চোখের চাপ বাড়ার ফলে চোখ শক্ত হয়ে যায় এবং এসময় চোখের চাপ সাধারণত ৫০ থেকে ১০০ মিঃ মিঃ মারকারি পর্যন্ত হয়ে যায়।

চিকিৎসা

এই পর্যায়টি চোখের একটি জরুরী অবস্থা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে না পারলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। চোখের চাপ অত্যাধিক থাকে বলে পাইলোকার্পিন ফোটা ছাড়াও এসিটাজোলামাইড ইনজেকশন বা ট্যাবলেটও দিতে হবে। পাইলোকার্পিন ২% ফোটা ওষুধ ৫ মিনিট পর পর অন্তত এক ঘণ্টা চোখে দিতে হবে। পরে আধাঘণ্টা পর পর ২ ঘণ্টা ও ২ ঘণ্টা পর পর ২৪ ঘণ্টা দিতে হবে। এর পর চোখের চাপ কমে গেলে গোনিওস্কোপি করে দেখতে হবে শতকরা ৫০ ভাগ বা তার বেশি অ্যাঙ্গেল পেরিফেরাল অ্যান্টেরিয়র সাইনেকিয়া হয়ে বন্ধ থাকলে আগের স্তরের ন্যায় পেরিফেরাল আইরিডেকটমি করে কোন ফল হবে না। এসব ক্ষেত্রে

www.banglainternet.com

প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার মতো ট্রাবিকুলেকটমি অপারেশন করতে হবে।

এই পর্যায়ে চোখের ব্যথা ও বমির জন্যও ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া ওপরের ওষুধে চাপ না কমাতে পারলে গ্লিসারোল ২ আউন্স মুখে খাওয়ানো যেতে পারে। তাতেও চাপ স্বাভাবিক না হলে শিরার মধ্যে (Intravenous) ম্যানিটল ইনজেকশন দিয়ে চোখের চাপ কমাতে হবে। পরে অপারেশন করতে হবে।

৪। *দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় (Chronic Stage)*

বার বার সবিরাম বা অ্যাকুট কনজেস্টিভ পর্যায়-এ আক্রান্ত হলে এবং তার সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগটি দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়ে পৌঁছে। এই অবস্থায় চোখের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমার ন্যায় কাপ-ডিস্কের অনুপাত বেড়ে যায়, দৃষ্টির পরিসীমা কমে যায় এবং গোনিওস্কোপিতে অনেক বেশি অ্যান্টেরিয়র সাইনেকিয়া দেখা যায়। চোখের চাপ স্বাভাবিকের চাইতে সামান্য বেশি থাকে।

গোনিওস্কোপি না করলে অনেক সময় এই পর্যায় কে প্রাথমিক অ্যাঙ্গেল খোলা গ্লুকোমা থেকে আলাদা করা কঠিন হয়।

চিকিৎসা

সাধারণত লেজার আইরডোটমি বা পেরিফেরাল আইরডোটমি করে এই পর্যায়ে চোখের চাপ কমানো সম্ভব হয় না সেজন্য ট্রাবিকুলেকটমি অপারেশন করে চিকিৎসা করতে হয়।

৫। *চূড়ান্ত পর্যায় (Absolute stage)*

এটি অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমার পরিণতি। এই অবস্থায় চোখে কিছু দেখা যায় না, এমনকি আলোও দেখা যায় না। চোখের কর্ণিয়া পানি জমে ঘোলা থাকতে পারে। পিউপিল বড় থাকে এবং আলোতে কোন সংকোচন হয় না। আইরিসে পূর্বের অ্যাকুট পর্যায়ে ভোগার ফলে এট্রফি থাকে। সর্বোপরি চোখের চাপ অনেক বেশি থাকে এবং এই কারণে মাঝে মাঝে চোখে ব্যথা হতে পারে।

www.banglainternet.com

Goto List >

চিকিৎসা

এই পর্যায়ে চোখের দৃষ্টির কোন চিকিৎসা নেই। শুধু ব্যথা কমাবার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের চোখে খুব ব্যথা ও যন্ত্রণা হলে (Painful blind eye) চোখ ফেলে দিতে হতে পারে।

www.banglainternet.com

Goto List >

গ্লুকোমা প্রতিরোধ

গ্লুকোমা প্রতিরোধের প্রধান শর্ত হলো এ বিষয়ে ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টি এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহ সকল সাধারণ চিকিৎসকের এ রোগ নির্ণয়ে অংশগ্রহণ। আর এ দুটো বিষয়কে সুষ্ঠভাবে কার্যকরি করার জন্য সমাজের শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং চিকিৎসক সমাজকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

ব্যাপক জন-সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল প্রচার মাধ্যমে (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন) সাধারণ মানুষের জন্য সহজ সাবলীল ভাষায় এবং অবশ্যই মাতৃভাষায় এ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রচার করতে হবে এবং এ কাজে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রামে-গঞ্জে চক্ষু শিবির করে যখন চোখের ছানি অপারেশন করেন তখন সম্ভাব্য রোগীদের (পয়ত্রিশোর্ধ নারী পুরুষ) গ্লুকোমা স্ক্রিনিং টেস্ট করা যেতে পারে। এতে সহজে সরাসরি রোগনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনগণের মধ্যে এ রোগটি সম্পর্কে একটা সচেতনতাও সৃষ্টি হবে।

সাধারণ চিকিৎসকদের (জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স) জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা যায়। ফলে এ রোগনির্ণয়ের বিভিন্ন আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে এ রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশে চক্ষু বিশেষজ্ঞের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাই সাধারণ চিকিৎসকদের এ বিষয়ে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

গ্লুকোমা রোগীও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি তার রোগ ও চিকিৎসার অভিজ্ঞতা তার আশেপাশের লোকজনকে জানালে তারা সহজেই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা করিয়ে চোখকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। এছাড়া পয়ত্রিশ বছর বয়সের পর বছরে একবার চোখের চাপ নির্ণয়সহ সম্পূর্ণ চক্ষু পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। এটা সবাই উপলব্ধি করলে গ্লুকোমা রোগটি প্রতিরোধ সহজতর হবে।

www.banglainternet.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার ধলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে লন্ডন যান এবং ডি ও (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪) এফ আর সি এস (আয়ারল্যান্ড, ১৯৬৬) এফ আর সি এস (এডিনবরা, ১৯৬৮) ডিগ্রী অর্জন করেন।

পরবর্তীকালে তাঁকে বি সি পি এস, বাংলাদেশ থেকে এফ সি পি এস (১৯৭৮) এবং রয়েল কলেজ অব অফথ্যালমোলজিস্ট, ইংল্যান্ড থেকে এফ আর সি অফথ (১৯৯০) প্রদান করা হয়। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন (১৯৭২ - ১৯৭৭)। বর্তমানে তিনি এম এ আই ইনস্টিটিউট অব অফথ্যালমোলজি ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল-এর পরিচালক এবং প্রধান কনসালট্যান্ট। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস-এর অবৈতনিক অফথ্যালমিক কনসালট্যান্ট। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে তাঁর প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির ট্রানজাকশান-এর প্রধান সম্পাদক (১৯৭৮ - ৭৯) এবং এশিয়া প্যাসিফিক চক্ষুবিজ্ঞান অ্যাকাডেমির বৈজ্ঞানিক কমিটির চেয়ারম্যান (১৯৯২) ছিলেন।

অধ্যাপক এম মুস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির সভাপতি (১৯৭৭ - ৭৮), লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল জেলা-৩১৫-এর গভর্নর (১৯৮৬ - ৮৭), বাংলাদেশে প্রথম চক্ষু ব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী পরিচালক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ আই কেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সমাজসেবা এবং চক্ষুবিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার জন্য তিনি স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, ডাঃ আলীম মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক ও স্যার জগদীশ চন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম ১৯৫৭ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা থেকে এম বি বি এস, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ ও সার্জনস থেকে এম সি পি এস (চক্ষু) এবং ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ও ডিগ্রী লাভ করেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি 'বাংলাদেশ টাইমস' পত্রিকার মেডিক্যাল রিপোর্টার (১৯৭৭-৮০) এবং দ্বি-ভাষিক মেডিক্যাল জার্নাল 'মেডিকেল ডাইজেস্ট' এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক (১৯৭৮ - ৮২) ছিলেন। 'চোখ ও চশমা' নামে তাঁর লেখা আরও একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে তিনি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে কর্মরত আছেন।